নভেম্বর বিপ্লব সংখ্যা

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জী
সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

২য় বর্ষ, ১ম বিশেষ সংখ্যা | মঙ্গলবার ১৫ই নভেম্বর ১৯৪৯, ২৯শে কার্ত্তিক, ১৩৫৬ | মূল্য—চার আনা

বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক

পৃথিবীর সর্বত্র গণতান্ত্রিক-সমাজবাদীদের

নেতাদের ভারতীয় শিশুরাষ্ট্র প্রত্যেকটা বিষয়ে কোন শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করে চলেছে—সে কথা আজ দিনের আলোর মত স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে। কি রাষ্ট্রনৈতিক, কি অর্থনৈতিক, কি সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রে দীর্ঘ আড়াই বছরের মধ্যে ভারতীয় সাধারণ মানুষের কোনই সুখ সুবিধা বাড়েনি বরং যতই দিন যাচ্ছে ততই তাদের দুঃখ দুর্দ্দশা বেড়েই চলেছে। একদিকে নতুন নতুন সুবিধা দিয়ে ধনিক শ্রেণীর মুনাফা লোঠবার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে বেশী করে, অন্যদিকে বেআইনী আইন আর অর্ডিন্যান্সের অক্টোপাশে মেহনতকারী ভারতবাসীকে পিষে মারার চেষ্টা চলছে; একদিকে মিল মালিক, জমিদার আর জোতদার দলের মুনাফার পাহাড় ফেঁপেই চলেছে অন্যদিকে শ্রমজীবি মানুষের প্রকৃত মজুরী কমিয়ে তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে; একদিকে চোরা কারবারীরা-মজুৎদারেরা চোরাকারবার চালিয়েও সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে বিচরণ করছে অন্যদিকে এই সমাজবিরোধী অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য হাজার হাজার প্রগতিবাদীকে কারারুদ্ধ রাখা হয়েছে।

ভুখা চাষী, মজুর, নিম্ন মধ্যবিত্তের দল নেতাদের ধনিক তোষণ নীতির প্রতিবাদ করায় অত্যাচারে নিষ্পেষিত অথচ কোটি কোটি টাকা কালোবাজারে লাভের কথা ছেড়ে দিলেও যে পুঁজিপতির দল হিসাব মতে লাভের ওপর ধার্য্য ১৪০ কোটি টাকা আয়কর সরকারকে ফাঁকি দিয়েছে তাদের চলছে তোয়াজ। এ অবস্থার অবসান পুঁজিবাদকে বাঁচিয়ে রেখে করার উপায় নেই; একমাত্র সমাজতন্ত্রের জয়েই এর প্রতিকার সম্ভব। অথচ জনগণের মুক্তি আন্দোলনে বিপ্লবী দর্শনের প্রতিষ্ঠা ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানের মারফৎ উচ্ছেদ করতে না পারলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব—এ হল বিজ্ঞানের শিক্ষা। এর জন্য সর্ব্ব প্রথমে দরকার বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার বিপ্লবীদল। কিন্তু ধনিক শ্রেণীও আজ চুপ করে বসে নেই, জনতাকে তাদের তাঁবেদারে রাখার জন্য তাদের ভুল বোঝাবার চেষ্টার ত্রুটিও নেই। আর এ কাজে ধনিক শ্রেণীর সাহায্যকারীর সংখ্যাও কম নয়; সুবিধাবাদী দলগুলির প্রত্যেকেই তাই এমন সব তত্ত্ব প্রচার করে চলেছে যাতে ভারতবর্ষে টাটা-বিড়লারাজ কায়েম থাকে, যাতে করে ভারতের মজুর শ্রেণী দিশেহারা ও বিমূঢ় হয়ে পড়ে পুঁজিবাদীদের আক্রমনের সামনে, যাতে করে তাদের রাজনৈতিক ভাবে দুর্বল ও নিঃসহায় করা যায়, যাতে করে তাদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ থেকে সরিয়ে আনা যায়।

ঘর ভেদী বিভীষণের কাজ

একাজ যেমনি শ্রমিক আন্দোলনের বাইরে থেকে করছে রক্ষণশীল পুঁজিপতিরা

তেমনি ভিতর থেকে আরও কৌশলে ক্ষতিকারক ভাবে চালাচ্ছে প্রচ্ছন্ন পুঁজিবাদীরা। অবশ্য এমন একদিন ছিল যখন এই ভেতর থেকে আক্রমণের প্রয়োজন হত না; যখন সমাজ বিজ্ঞানের বিপ্লবী দর্শন মার্কসবাদকে যেন তেন প্রকারে নিছক গালাগালি করতে পারলেই সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যেত, পণ্ডিত বলে সুখ্যাতি রটত, এমন কি এই পণ্ডিত মুর্খতার পুরস্কার হিসেবে মোটা বেতনের চাকুরীও জুটে যেত। কিন্তু সে অবস্থা বেশী দিন রইল না, জনতাকে চিরকাল যাতা কথা বলে

লেখক—নীহার মুখার্জী

কেন্দ্রীয় কমিটীর সভ্য

ভুলিয়ে রাখা আর সম্ভব হল না—মার্কসবাদ অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে যেতে লাগল সমস্ত বিরুদ্ধ মতবাদকে নস্যাৎ করে। পুঁজিবাদী ও তার দালালরাও মার্কসবাদকে আক্রমণ করার কৌশল ফেলল বদলে, তারা বুঝল বাইরে থেকে আঘাত হেনে বিপ্লবী দর্শনকে দুর্বল করার পরিবর্ত্তে সবল করাই হবে। তাই চেষ্টা চলতে লাগল মার্কসবাদী সেজে মার্কসবাদকে বিকৃত করে তাকে দুর্বল করার, তার বিপ্লবী শিক্ষাকে বাদ দিয়ে তাকে ধনিক শ্রেণীর গ্রহণযোগ্য করে তোলার এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক ও বিপ্লবে অন্যান্য সাহায্যকারী সামাজিক শক্তিগুলিকে বিপ্লবী দর্শন সম্বন্ধে ভুল শিক্ষা দিয়ে দুর্বল করার। এই কাজে সর্ব্বপ্রথমে যিনি এগিয়ে এলেন তিনি হচ্ছেন এক কালের গোঁড়া মার্কসবাদী বার্ণষ্টিন; দাবী তাঁর—"amendment to Marx, revision to Marx, revisionism."—মার্কসবাদকে সংস্কার করে ছেঁকে ভদ্রস্থ করতে হবে। তারপর থেকে এ চেষ্টার বিরাম নেই। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ঝানু পণ্ডিত কাউটস্কি, সিদম্যান, ইবার্ট, টুরাটি, হুগানি, ত্রিভে, ব্লুম, মখ, রামাদিয়ে, এটলি, বেভিন, মরিসন এমন কি আমাদের জয়প্রকাশ, নরেন দেও, অশোক মেহেতা—সকলের মুখেই সেই এক কথা—"It is open in the same manner for a Marxist···to seek to develop and refine the partial truths of Marxism" (My picture of Socialism—Jaya Prakash)। এই সব পণ্ডিত প্রবরদের মার্কসবাদকে পরিশুদ্ধ করার ইতিহাস খোঁজ নিলে দেখা যাবে আজ পর্য্যন্ত এদের ইতিহাস হল শোষিত শ্রেণী উপশ্রেণীগুলির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। সুতরাং কোন অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়ে আজকের দিনের ঘোলাটে রাজনৈতিক আবহাওয়ায় বিচার করে দেখতে হবে—আসলে এঁরা কি, শোষিত শ্রেণী উপশ্রেণীর বন্ধু না কায়েমী স্বার্থের রক্ষক, ফ্যাসিবাদের শেষ ও সর্ব্বাপেক্ষা কৌশলী বন্ধু। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যে ভাবে দ্রুত এগিয়ে চলেছে শোষিত ও শোষক শ্রেণীর মধ্যে শেষ শ্রেণী-সংগ্রাম বিশ্ববিপ্লবের দিকে তাতে করে আজও যদি শোষিত ভারতবাসী তার আসল শ্রেণী বন্ধু চিনে নিতে না পারে তাহলে তার ভবিষ্যত উজ্জ্বল নয়—স্বীকার করতেই হবে।

জার্ম্মান সোস্যালিষ্ট পার্টি—হিটলারশাহীর জন্মদাতা

পৃথিবীর বিভিন্ন সোস্যালিষ্ট পার্টিগুলির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হিসেবে পরিচিত ছিল জার্ম্মানীর সোস্যালিষ্ট পার্টি; অথচ এরাই কায়েম করিয়েছে জার্ম্মান ফ্যাসিবাদ। প্রকৃত সমাজবাদের সমর্থকদের যেখানে কর্ত্তব্য হচ্ছে বুর্জ্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া, শ্রমিক শ্রেণী ও অন্যান্য মেহনতকারী জনতাকে এই প্রতিবিপ্লবী চিন্তাধারা থেকে রক্ষা করে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সেখানে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্তর্গত নামে সমাজতন্ত্রী দলগুলির প্রত্যেকটি পিতৃভূমি রক্ষার অজুহাতের আড়ালে প্রথম বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে পূর্ণ সমর্থন করে এক দেশের শ্রমিককে অন্য দেশের শ্রমিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিতই করেছিল। প্রকৃত সমাজতন্ত্রী দল হিসেবে রাশিয়ার বলশেভিক দলের মত যেখানে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করে শ্রমিক শ্রেণী কর্ত্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করান উচিত ছিল সেখানে এই গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা ধনিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার তল্পিদার হিসেবে কাজ করে গেল। ধনতন্ত্রের সংকট যখনই তীব্র হয়েছে, যখন শুধু এক তরফা পুঁজিবাদী নিষ্পেষণের জোরে বিক্ষুব্ধ জনশক্তিকে পরাস্ত করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি তখনই ডাক পড়েছে এই সব গণতান্ত্রিক-সমাজবাদীদের। এরাও সাগ্রহে এগিয়ে এসেছে ধনতন্ত্র রক্ষার কাজে।

১৯১৮ সালে প্রথম মহাযুদ্ধে জার্ম্মানীর পরাজয়ের পর জার্ম্মান শ্রমিক শ্রেণী যখন ক্ষমতা দখলের লড়াই হিসেবে সাধারণ ধর্ম্মঘট আরম্ভ করে তখন জার্ম্মান সোস্যাল ডিমোক্র্যাটদলের নেতা সিদম্যান, ইবার্ট ও ব্রণ সে আন্দোলনকে পিছন থেকে আঘাত করে ধর্ম্মঘট বানচাল করে দেন এবং মালিক পক্ষ ও সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে আপোষ করে ক্ষমতা দখল করেন। পুঁজিপতির দলও বোঝে যে নামধারী এই সোস্যালিষ্ট গোষ্টির দ্বারা তাদের লাভ শুধু পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান থাকবে তা নয়, উপরন্তু দীর্ঘ দিন ধরে সংগ্রাম করে শ্রমিক শ্রেণী যে ঐক্যবদ্ধ সংগঠিত শক্তি লাভ করেছে তাকেও নিশ্চিহ্ন করা যাবে। তাই Federation of German Industry তার সদস্যদের কাছে যে বুলেটিন পাঠায় তাতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানায় "—ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সামাজিক ভিত্তি দৃঢ় করতে হলে মহাযুদ্ধের পর শ্রমিক আন্দোলনের ঐক্য নষ্ট করা দরকার। কেবল মাত্র বুর্জ্জোয়া শ্রেণীদ্বারা রাষ্ট্রশাসনে এ সম্ভব নয়; কাজেই অন্যান্য সামাজিক স্তরের সঙ্গে যোগাযোগ প্রয়োজন। এই দিক থেকে যুদ্ধোত্তর যুগের প্রথম পাদে বুর্জ্জোয়া শাসন রক্ষার শেষ প্রাচীর সোস্যাল ডিমোক্র্যাসি" (বুলেটিন নং ১২) ধনিক শ্রেণীর এই বিশ্বাসের সম্পূর্ণ মর্য্যাদা এই সব ভেকধারী সমাজতন্ত্রীর যে রেখেছিলেন তা এঁদের নিজেদের স্বীকৃতি থেকে প্রমানিত হয়, ঘটনাও তাই বলে। এঁদেরই প্ররোচনা ও

ইতিহাস বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস

সমর্থনে সামরিক কর্তৃপক্ষ বিপ্লবী শ্রমিকের রক্তে বার্লিনের পথ ভাসিয়ে দিয়েছিল; লিবনেক্ট ও রোজালুকসেমবার্গের মত নেতাদের পশুর মত হত্যা করেছিল পুঁজিপতিদের ভাড়াটেরা এঁদেরই ইঙ্গিতে; এঁদেরই গণতান্ত্রিক মহিমার ছত্রছায়ায় জন্ম নেয়, গড়ে ওঠে, শক্তি লাভ করে পূর্ণ রূপ নেয় হিটলারের ফ্যাসিবাদ। ১৯৩২ সালে ফ্যাসিষ্ট নেতা ফন্ প্যাপেন যখন সোস্যাল ডিমোক্র্যাট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করেন তখন এই গণতান্ত্রিক সমাজবাদে বিশ্বাসী সোস্যাল ডিমোক্র্যাট মন্ত্রী বণ ও সেভারিং তাঁদের কাজের সাফাই হিসেবে বলেন —"The Prussian Government is in a position with police statistics to prove that police interferance has caused more deaths on the Left than on the Right" (Memorandum to Hindenburg 19th July, 1932)। আর একজন প্রধান সোস্যালিষ্ট মন্ত্রী নস্কে—হিটলার কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পরও হিটলারের প্রশস্তি গেয়ে অনুরোধ করেন যেন তাঁর পেনসন বন্ধ করে না দেওয়া হয়; কারণ বার্লিনের বিপ্লবী মজুরদের নিশ্চিহ্ন করার কাজে তাঁর দান অসামান্য।

জার্ম্মান সোস্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির অতীত জঘন্যতম কলঙ্কময় ইতিহাস বাদ দিলেও তার বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ কম বিশ্বাসঘাতকতায় পূর্ণ নয়। বর্ত্তমান জার্ম্মান সোস্যাল ডিমোক্র্যাট নেতা সুম্যাখার ও ষ্টামফার মার্কিন বিশ্ববিজয়ের চেষ্টাকে নিজের দেশে সফল করার দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন। হিটলারের New order প্রতিষ্ঠা যখন সম্ভব হল না, প্রগতিবাদী গণশক্তির আঘাতে তা যখন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল তখন বসে থাকলে চলবে না; তাই নতুন করে মার্কিনী New order প্রতিষ্ঠার কাজে তাঁরা এগিয়ে এসেছেন। সোস্যালিষ্ট না হলে নতুন করে আর কে আছে নাৎসীদের নিয়ে সৈন্যদল গড়বে, শ্রমিক শ্রেণীর ওপর নির্য্যাতন চালাবে ও সাম্রাজ্যবাদের হয়ে পাহারা দেবে?

সব সাম্রাজ্যবাদই শোষণমূলক নয়—ফরাসী সোস্যালিষ্টদের মত

এতদিন জানা ছিল সমাজবাদে ঔপনিবেশিক শোষণের কোন স্থান নেই; আর বাস্তবে যে কোন স্থান থাকতে পারে না তা সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রমাণ করে দিয়েছে। কিন্তু ফরাসী সোস্যালিষ্টদের মুখে এখন সাম্রাজ্যবাদের প্রশংসার বন্যা বইছে। সাম্রাজ্যবাদ এখন তাঁদের কাছে হয়ে উঠেছে Humane Colonialism, মহান সাম্রাজ্যবাদ। আজ ফ্রান্সে শিল্প জাতীয়করণ শুধু বন্ধ হয়েছে তা নয়, কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে সম্মিলিত মন্ত্রীসভার সময় যে সমস্ত শিল্পের জাতীয়করণ হয়েছিল সেগুলিকেও এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফরাসী সোস্যালিষ্ট নেতা লিঁও ব্লুম হঠাৎ আবিষ্কার করেছেন—"সব ধনিক রাষ্ট্রই বর্জ্জনীয় নয় এবং সব সাম্রাজ্যবাদই শোষণমূলক নয়।" তাঁর মতে সাম্রাজ্যবাদ আজ রূপ নিয়েছে মহান সাম্রাজ্যবাদে; অথচ ভূতপূর্ব্ব ফরাসী সোস্যালিষ্ট মন্ত্রী Moutet সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন—পশ্চিমী দেশগুলি তাদের এশিয়ার ঘাঁটি গুলি অবশ্যই রক্ষা করবে। এরই স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত হিসেবে ইন্দোচীনে আড়াই লাখ মুক্তি যোদ্ধাকে নির্মূল করা হয়েছে, মাদাগাস্কারে ৯৫ হাজার স্বাধীনতাকামীর বুকের রক্তে মাটি ভেজান হয়েছে। এরই নাম ব্লুমের মহান সাম্রাজ্যবাদ। কে না জানে মার্শাল প্ল্যানের উদ্দেশ্য হল—পশ্চিম ইউরোপকে আমেরিকার ভাঁবেদারে পরিণত করে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ ঘাঁটিতে পরিণত করা। মার্কিনী হরিম্যানের রিপোর্টেও এ কথা অস্বীকার করা হয়নি বরং তাতে খোলাখুলিভাবেই স্বীকার করা হয়েছে—"ইউরোপে মার্কিনের স্বার্থ শুধু অর্থনৈতিক নয়; সামরিক ও রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থও তার দ্বারা রক্ষিত হবে।" অথচ ফরাসী সোস্যালিষ্টদলের নেতা লিঁও ব্লুম গদগদভাবে মার্শাল পরিকল্পনার প্রশংসা করে লিখলেন—"Disinterested, noble, the fruit of an almost religious feeling of international duty।" পৃথিবীর ইতিহাসে এইরকম নিঃস্বার্থ ত্যাগ স্বীকার ও মানবতাপূর্ণ পরিকল্পনা নাকি দেখা যায় নি; তাই না ফ্রান্সে তিন তিনবার মুদ্রা মূল্য হ্রাস করিয়েও অর্থনৈতিক সংকটকে রোধ করা যাচ্ছে না। হাজারে হাজারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান লালবাতি জ্বালছে, লাখে লাখে বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, মেহনতী মানুষের প্রকৃত আয় দিনের পর দিন কমতির দিকেই চলেছে।

বৃটিশ লেবারদল প্রতিক্রিয়ার মোক্ষম হাতিয়ার

একটা কথা বলা যেতে পারে ফরাসী সোস্যালিষ্টরা একা মন্ত্রীত্ব গঠন করতে

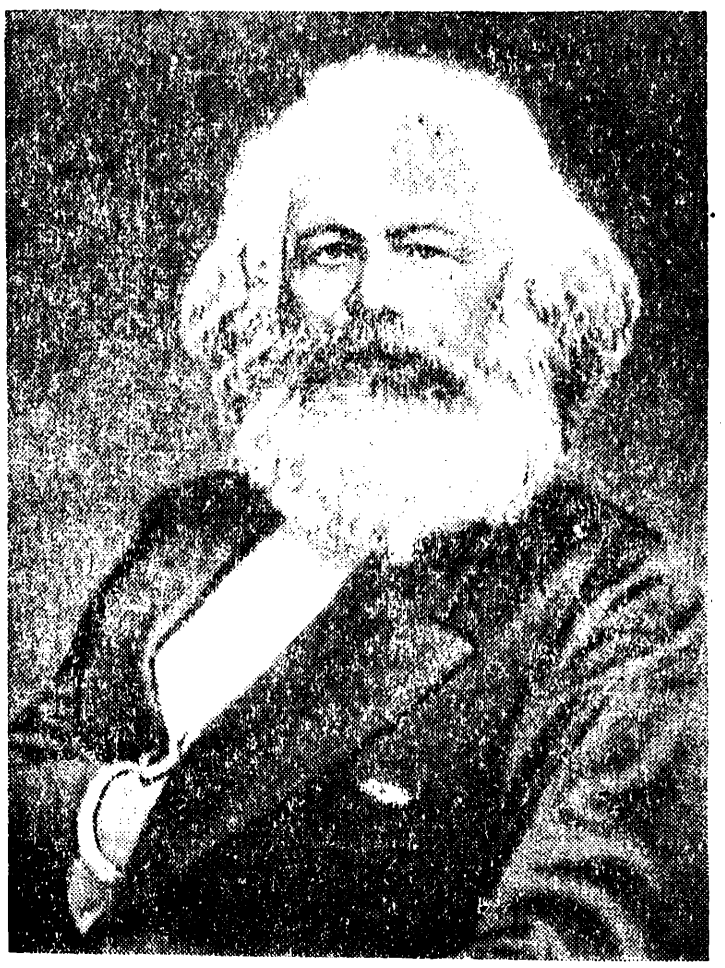

"Between Capitalist and Communist Society lies the period of revolutionary transformation of the one into the other. There corresponds to this also a political transition period in which the state can be nothing but the revolutionary dictatorship of the proletariat"—Marx.

সম্ভব নয় তাই তারা কোন সমাজতান্ত্রিক কাজ করতে সক্ষম হয় নি। এ কথা সর্বৈব মিথ্যা তা প্রমান করার মত যথেষ্ট মাল মশলা থাকা সত্বেও তর্কের খাতিরে এ কথা স্বীকার করে নিয়ে জিজ্ঞাস্য জার্ম্মানীতে ত একক দল হিসেবে বৃহত্তম দল ছিল জার্ম্মান সোস্যাল ডিমোক্র্যাটপার্টি তবুও কেন সমাজতন্ত্রের বদলে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠিত হল জার্ম্মানীতে? গ্রেট বৃটেনেও ত গণতান্ত্রিক সমাজবাদী বৃটিশ লেবার পার্টি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত; সেখানেই বা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না কেন? সমাজতন্ত্রের কথা দূরে থাকুক চার্চিলের নীতি হতে এদের পার্থক্য কিছু নেই বল্লেই চলে। ১৯৩৭ সালে বর্ত্তমান বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী এটলি সাহেব ঘোষণা করেছিলেন—"There is a deep difference of opinions between the Labour Party and the Capitalist Parties on foreign as well as home policy।" আজ বৈদেশিক ও সরাষ্ট্র নীতিতে কোন পার্থক্য আছে কি শ্রমিক সরকারের সঙ্গে রক্ষণশীল দলের? চার্চিল ও বেভিন উভয়ের পররাষ্ট্র নীতি হল—March with America। এ কথা রক্ষণশীল দলের কাগজ Daily Telegraph পরিস্কার করে দেখিয়ে মন্তব্য করেছে, "বৈদেশিক ও সাম্রাজ্যের ব্যাপারে রক্ষণশীল ও লেবার সরকারের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই; এই কারণেই চার্চিল ১৯৪৮ সালের ২৩শে জানুয়ারী তারিখের বক্তৃতায় বেভিনের পররাষ্ট্র নীতির তারিফ করে বলেন—"মোটের ওপর লেবার সরকার বৈদেশিক নীতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছে এবং এই কারণে রক্ষণশীলদল লেবার সরকারকে সর্বপ্রকার সাহায্য করে চলেছে;" এই সেদিনও চার্চিলের সহকারী এণ্টনি-ইডেন বেভিনের নীতিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। ঝানু রক্ষণশীল চার্চিলের সঙ্গে শ্রমিক দলের বেভিনের বৈদেশিক বিষয়ে কোন পার্থক্য নেই—এই একটা বিষয় থেকেই গণতান্ত্রিক সমাজবাদী বৃটিশ লেবার দলের আসল চরিত্র বুঝতে কষ্ট হয় না। শুধু তাই নয় বৃটিশ লেবার প্রভুরা নাকি totalitarianism এর বিরুদ্ধে। অথচ এই totalitarianism এর পূর্ণ রূপ যদি কোথাও থাকে তা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেখানকার ২০০টি

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের আদেশে লাখ

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)

করপোরেশন সমস্ত মার্কিনের অর্থনীতিকে শাসন ও রাষ্ট্রনীতি পরিচালিত করে। সেই রাষ্ট্রেরই শ্রেষ্ঠ সহচর গ্রেট বৃটেন। গ্রীসে কিসের জন্য বৃটিশ সৈন্য রয়েছে? সে কি এই totalitarianism রক্ষার জন্য নয়? গ্রীক সোস্যালিষ্ট পার্টিও বৃটিশ লেবার গভর্ণমেণ্টকে জানাতে বাধ্য হয়েছে—"Counter revolution is directed with equal fury against socialist and other progressive elements and against the entire working class"। এ হেন প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে সাহায্য করা কি গণতন্ত্র বাঁচাবার জন্য? মালয়ে যা হচ্ছে তা কি গণতন্ত্রের জন্যই? মধ্যপ্রাচ্য, সাইপ্রাস প্রভৃতি জায়গায় কি নিছক পরোপকারের প্রবৃত্তির বশেই কাজ করা হচ্ছে? এর পরিষ্কার জবাব New Statesman and Nation দিয়েছে—"We won Malaya by the sword and we are keeping Malaya by the sword।" এর পর বৃটিশ গণতান্ত্রিক সমাজবাদীদের সম্বন্ধে বোঝাবার প্রশ্নই ওঠে না।

বৈদেশিক নীতি যার এই রকম প্রতিক্রিয়াশীল তার আভ্যন্তরীণ নীতিও এই ধরণের হতে বাধ্য কারণ এই দুই নীতির মধ্যে গভীর সম্পর্ক আছে; একটা এক ছাঁচে ঢালা হলে অন্যটাও সেই ছাঁচে না ঢেলে উপায় নেই। এটলি বেভিন মরিসনের সমাজতন্ত্র আজ মিশ্র অর্থনীতিতে এসে ঠেকেছে যাতে ২০ ভাগ শিল্পের জাতীয়করণ হবে আর বাকি ৮০ ভাগ থাকবে পুঁজিপতিদের নিজেদের অধিকারে। এই ধরণের জাতীয় করণ সমাজতন্ত্র নয়; রাষ্ট্রীয় পুঁজির একেন্দ্রীকরণ এবং এরই কল্যানে বৃটীশ শিল্পপতিদের অবস্থা ক্রমশঃ ভালর দিকে যাচ্ছে আর শ্রমিক ও কর্ম্মচারীরা দুরবস্থার অতল তলে নেমে চলেছে। যে ভাবে জাতীয় করণ করা হচ্ছে তাতে পুঁজিপতিদের যোল আনাই লাভ—ক্ষতিপূরণ বাবদ একদিকে প্রচুর খেসারৎ মিলছে অন্যদিকে মালিকের দল ম্যানেজার প্রভৃতি হয়ে মোটা মাইনে লুঠছে। একটা উদাহরণ দিলে ক্ষতিপূরণের পরিমাণটা বোঝার সুবিধা হবে। টিলিংস বাস কোম্পানীর ১ পাউণ্ড দামের শেয়ারের জন্য ক্ষতিপূরণ পাবে মালিক ৬ পাউণ্ড। এই সব কারণে বহু ফেল পড়া শিল্পের মালিকরা জাতীয় করণের পরম ভক্ত হয়ে উঠেছে। লেবার গভর্ণমেণ্টের আমলে লাভের মাত্রাও চলেছে বেড়ে পুঁজিপতিদের বেলায়। ১৯৪৪ সালে ১০৬৩টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যেখানে লাভ হয়েছিল ২৫ কোটি ৭০ লাখ পাউণ্ড লেবার সরকার রাষ্ট্র কর্তৃত্ব হাতে নিলে ১৯৪৫ সালে তা দাঁড়ায় ২৭ কোটিতে; তার পরের বছর তা আরও ২১ কোটি ৪০ লাখ পাউণ্ড বাড়ে এবং গত বছর তা গিয়ে ওঠে ৬১ কোটি পাউণ্ডে! পুঁজিপতিদের এই লাভ অথচ শ্রমিকদের মজুরী বেঁধে দেওয়া হয়েছে কিন্তু প্রতিদিন জীবন যাত্রার খরচও বেড়ে চলেছে।

বৃটীশ গণতান্ত্রিক সমাজবাদী লেবার সরকারের এই গেল বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ নীতি; সম্রাজ্য নীতি আরও চমৎকার। ফ্যাসিষ্ট মোসলে, রক্ষণশীল চার্চিল, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী এটলি, সকলেরই লক্ষ্য কেমন করে উপনিবেশ গুলিকে আরও ভালভাবে লুণ্ঠন করা যায়। বৃটীশ লেবার গভর্ণমেণ্ট যে চারসালা ঔপনিবেশিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তাতে দেখান হয়েছে ১৯৪৮-৪৯ সালে উপনিবেশ থেকে আয়ের পরিমাণ সাড়ে ৩ কোটি পাউণ্ড হলেও ১৯৫২-৫৩ সালে তা ২৬ কোটি ৩০ লাখের মত হবে। সুতরাং এতে চার্চিল গোষ্ঠির সম্মতিও মিলেছে। এই হল বৃটীশ অভিজাত লেবারদের সমাজবাদী নীতি ও প্রচেষ্টা।

ইতালীর সোস্যালিষ্ট নেতা মুসোলিনী ফ্যাসিবাদের প্রবর্ত্তক

ফ্যাসিষ্ট মুসোলিনী ইতালীর সোস্যালিষ্ট নেতা ছিলেন—এটাই বড় কথা নয়। যখন ধীরে ধীরে ফ্যাসিবাদ সমগ্র ইতালীকে গ্রাস করে ফেলছিল, শ্রমিকদের ওপর অত্যাচারের বন্যা নেমে এসেছিল তখনও সোস্যাল ডিমোক্র্যাট নেতা টুরাটি তাকে পূর্ণ সমর্থন করে গিয়েছেন বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে। ইতালীয় সোস্যালিষ্ট পার্টি আজও সেই বিশ্বাসঘাতকতার বোঝা বয়ে চলেছে। দক্ষিণ পন্থী সোস্যাল ডিমোক্র্যাট নেতা সারাগাত ইতালীকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পায়ে বিকিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করে এখনও চলেছে।

লেবার, নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া ও অষ্ট্রীয়ার সোস্যালিষ্টরা ফ্যাসিবাদেরই সাহায্যকারী

ব্রহ্মায় যে সরকার আজ শাসন চালাচ্ছে তাও প্রকৃত পক্ষে বর্ম্মার সোস্যালিষ্ট দল। সেখানেও সেই একই ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীর ক্রীড়াণক হিসেবে কাজ করে চলেছে বর্ম্মা সরকার। দেশের শতকরা ৯০ জনের বিরুদ্ধে ন্যু সরকার তার ইঙ্গ মার্কিন তোষণ নীতি চালিয়ে চলেছে; এই সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিবাদী শিবিরের কায়েমী স্বার্থের কাছে বর্ম্মার জাতীয় স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে বাধে নি সোস্যালিষ্ট ন্যুর। মুষ্টিমেয় ভারতীয় চেট্টিয়ার সম্প্রদায় বর্ম্মার জমির শতকরা ৮০ ভাগের অধিকারী; এই কায়েমী স্বার্থ বাঁচান বিষয়ে নেহেরু ও ন্যু একমত। শিল্পের শতকরা ৭৫ ভাগের বেশী বৃটীশ পুঁজিপতিদের অধিকারে। অথচ নূতন সর্ত্তানুসারে তাকে জাতীয়করণ করা যাবে না। শুধু তাই নয় জাপানী যুদ্ধের সময় বৃটীশ কোম্পানীগুলির যে ক্ষতি হয়েছিল তাও ন্যু সরকার দেবে এই বৃটীশ পুঁজিপতিদের। বিনিময়ে আগামী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে বর্ম্মাকে রক্ষা করার জন্য সেখানে সামরিক ঘাঁটি গেড়ে বর্ম্মাবাসীদের কৃতার্থ করবে ইঙ্গ মার্কিন চক্র। আর বর্ত্তমানে ত গোলাগুলি, সামরিক উপদেষ্টা দিয়ে সাহায্য করছে যাতে গণশক্তিকে ভালভাবে শায়েস্তা করে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করা যায়। ফলে এক ১৯৪৮ সালেই বৃটেন বর্ম্মা থেকে ১ কোটি টাকা মুনাফা লোঠে।

নিউজিল্যাণ্ডে গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা একাধিক্রমে ১০ বছর শাসন চালাচ্ছে; অথচ যেখানে সমাজতন্ত্রের এতটুকু কণাও প্রতিষ্ঠা করার কোন চেষ্টা হয় নি। অষ্ট্রেলিয়াতেও সেই অবস্থা। উপরন্তু মালয়ের মুক্তি যোদ্ধাদের ওপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে অষ্ট্রেলিয়ার ডক শ্রমিকরা যখন জাহাজে অস্ত্র শস্ত্র বোঝাই করতে অস্বীকার করল তখন তাদের ওপর নির্ম্মম জুলুম চালাতে বাধল না এই সব নামধারী সমাজতন্ত্রীদের।

আর অষ্ট্রীয়ার সোস্যাল ডিমোক্র্যাট নেতা অটোবয়ারের গণতন্ত্রী শাসনের আমলে পুঁজিপতির দল ইচ্ছামত মুনাফা লুঠে চলল বাধা দেওয়া হল না; ফ্যাসিষ্ট ডলফাস ধীরে ধীরে সংগঠন গড়ে তুলতে লাগল সমাজতন্ত্রী সরকার দেখেও দেখল না; কিন্তু শ্রমিক শ্রেণী যখন নেতাদের এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদ করল তখন তাদের গুলির মুখে ঠাণ্ডা করা হল। ফলে নিশ্চিন্তে ও নির্বিবাদে ফ্যাসিষ্টরাজ স্থান নিল সোস্যাল ডিমোক্র্যাট রাজের। এ হল প্রথম মহা যুদ্ধের পরের ইতিহাস। বর্ত্তমান ইতিহাসও সেই এক ধারায় চলেছে। পুলিশ বাহিনীর নাম করে ভূতপূর্ব নাৎসী সমর্থকদের একত্রিত করা হচ্ছে; ফ্যাসিষ্ট সামরিক জেনারেল ষ্টাফেরা আজও সামরিক বিভাগ অলঙ্কৃত করে রয়েছে এবং মার্কিন কর্ত্তাদের আদেশানুসারে নতুন করে সমস্ত ফ্যাসিষ্ট সংগঠণগুলিকে গড়ে তোলা হচ্ছে। এ সবই করে চলেছে সোস্যালিষ্ট নিয়ে গঠিত অষ্ট্রীয়ার সমাজতান্ত্রিক সরকার।

ভারতীয় শাখা জয়প্রকাশী সমাজতন্ত্রীরাও আসলে পুঁজিবাদী ফ্যাসিবাদীর দালাল

সুতরাং বিভিন্ন দেশের সোসালিষ্ট পার্টিগুলির ইতিহাসে আলোচনা করে দেখা গেল ক্ষমতা দখলের আগে তারা যত গালভরা বড় বড় সমাজতন্ত্রের কথা বলুক না কেন, ক্ষমতা পেয়ে তাদের কেউ আজ পর্য্যন্ত কোথাও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেনি বরং পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে তার দুর্ব্বলতম সময়ে টিকিয়ে রেখেছে ও বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীকে খাঁটী জাঁদরেল বুর্জোয়ার মত নিষ্পেষণে নিশ্চিহ্ন করেছে। গোটা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ইতিহাস হল—এই বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। ভারতীয় সোস্যালিষ্ট পার্টি জয়প্রকাশী সমাজতন্ত্রীরা এরই ভারতীয় শাখা। সুতরাং এদের সম্বন্ধে আলাদা কিছু ভাবার কারণ ঘটেনি বিশেষ করে তাদের চিন্তাধারা ও কার্য্যাবলীও সেই একই বিশ্বাসঘাতকতার খাতে যখন বইছে। জয়প্রকাশী দল সমাজতন্ত্রী কিন্তু কংগ্রেসী ফ্যাসিষ্টদের সহযোগিতায় শ্রমিকের ধর্ম্মঘট ভাঙতে বাধে না, পুলিশী গুপ্তচরের কাছে সংগ্রামী শ্রমিকদের ধরিয়া দিতে আপত্তি নেই, শ্রমিককে সংগ্রামে নামিয়ে দিয়ে তাকে পিছন থেকে আঘাত করে মন্ত্রীত্ব লাভের চেষ্টা করতে আটকায় না, সাম্যবাদ বিরোধীতার নামে ফ্যাসিবাদের প্রশংসা ও তাকে সাহায্য করতে অসুবিধা হয় না এবং সর্ব্বশেষে ঝানু ঝানু পুঁজিবাদীদের কাছ থেকে সোস্যালিজম প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রমিক স্বার্থ বিকিয়ে দিতে একটুকুও দ্বিধা আসে না। যে কারণে Federation of German Industry জার্ম্মাণ সোস্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল ঠিক সেই কারণেই ভারতবর্ষের পুঁজিপতি শ্রেণীর মুখপাত্র হিসেবে বর্দ্ধমানের মহারাজা, নবাব কে. এম. ফারুকী, চটকল মালিক সমিতির সভাপতি বাগেরিয়া, ভারতীয় পাটকল সমিতির প্রেসিডেণ্ট ওয়াকার, ভারতীয় খনি মালিক সমিতির প্রেসিডেণ্ট কে. বসু,

লাখ শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী নিহত

বীরেণ মুখার্জী প্রভৃতিরা জয়প্রকাশ নারায়ণকে ভোজে নিমন্ত্রিত করছেন। জয়প্রকাশ ও তাঁর দল যে এ বিষয় তাঁদের নিরাশ করবেননা, এটা তাঁরা ভালভাবেই জানেন। এই হল এই সব গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীদের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস।

গণতান্ত্রিক সমাজবাদ সুবিধাবাদের নামান্তর

গণতান্ত্রিক সমাজবাদের এই জঘন্য ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার আগে পর্য্যন্ত অন্ততঃ বইপত্তরে প্রচারিত হত—গণতান্ত্রিক সমাজবাদের লক্ষ্য ব্যক্তিগত মালিকানা ও মুনাফা ব্যবস্থার লোপ এবং শিল্প, বিনিময় ব্যবস্থা প্রভৃতির জাতীয় করণ। আজ আর সে কথা বলারও উপায় নেই। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ, নাৎসী জার্ম্মাণীর জাতীয় সমাজবাদ যে পুঁজিবাদের পূর্ণ রূপ একথা আজ আর অস্বীকার করার উপায় নেই; তাই বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের মুখ থেকেও শোনা যায়—"...the difference between stabilised and regulated capitalism and technically perfected and nationalised socialism is not very great" (Modern capitalism—Sombart); তাই বৃটিশ লেবারপার্টি তার নির্ব্বাচনী ইস্তাহার, Labour Believes in Britainয়ে লেখে—"The managers and owners of private industry are trustee responsible to the nation"। চমৎকার সমাজবাদ! সোস্যালিজমের উদ্দেশ্য শ্রেণীশোষণ ধ্বংস নয়, পরিকল্পিত অর্থনীতির অধীনে ভিন্ন ভিন্ন বিরোধী স্বার্থের সমন্বয়। মার্কসবাদের ভিত্তি শ্রেণী সংগ্রাম ভোজবাজীর মত উড়ে গিয়ে পড়ে রইল—শ্রেণীসমন্বয়। তবু এরা এল মার্কসবাদী সমাজবাদী।

কেন এ বিচ্যুতি

বিভিন্ন দেশে সোস্যালিষ্ট পার্টিগুলির এই বিচ্যুতির মূল কারণ কি? দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সব নেতাই বদমায়েস ও ধনিকশ্রেণীর দালাল ছিলেন তা নয় তবুও কেন তাঁদের এ বিচ্যুতি? এর একমাত্র জবাব দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ভুল চিন্তাপদ্ধতি। সমাজবিজ্ঞান একটা বিজ্ঞান; তার মূল নীতিকে অস্বীকার করে এগুতে গেলে পদে পদে ভুল হবার সম্ভাবনা। অথচ এই সব ঝানু পণ্ডিত গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা মার্কসবাদ dogma নয়, "The movement is everything, the final aim is nothing" (Bernstein)—এই কথার আড়ালে মার্কসবাদের fundamental principle কে অস্বীকার করেছেন। আমাদের দেশের জয়প্রকাশ ত বলেই ফেলেছেন—"There can be no room for dogmatism or **Fundamentalism** in Marxist thought" (My picture of socialism Jaya Prakash)। মার্কসবাদে dogma র স্থান নেই এটা ঠিক কিন্তু তাই বলে এর কোন fundamental নেই এ কথা বলা আর মার্কসবাদকে সুবিধাবাদ বলা একই কথা। মার্কসবাদ হল বিজ্ঞানসম্মত এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি কেবলমাত্র যার দ্বারাই মানব সমাজের পরিবর্ত্তনের ইতিহাসকে যথাযথভাবে অনুধাবন করা ও সমাজের স্বাভাবিক অগ্রগতিকে তার যুক্তিসঙ্গত লক্ষ্যে চালিত করা যেতে পারে। তাই স্থান, কাল, পরিবেশের পার্থক্যের জন্য বিভিন্ন দেশে এর প্রয়োগও ভিন্ন হতে বাধ্য। এই হিসেবে, মার্কসবাদ ছককাটা বাঁধাধরা দর্শন নয়, dogmaও নয়। কিন্তু প্রয়োগের এই পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সমস্তগুলির মধ্যে একটা সাধারণ চিন্তাধারা তার আছে, যেটা বিভিন্ন সমস্যাকে বিচার করার দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গিই হল মার্কসবাদের "General guiding principle"; এই হল তার fundamentalism আর এই মূলনীতি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, শ্রেণীসংগ্রাম ও সর্ব্বহারার একনায়কত্ব এই তিনটি বনিয়াদী চিন্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এর কোনটাকে অস্বীকার করলেই মার্কসবাদ থেকে, বিজ্ঞান থেকে বিচ্যুত হতে হবে; আর জানার উপায় হিসেবে বিজ্ঞানকে ত্যাগ করলে তা গিয়ে দাঁড়ায় মনগড়া মতলব, সুবিধাবাদে। গণতান্ত্রিক সমাজবাদী দলগুলি মার্কসবাদের এই তিনটি মূলনীতির কোনটাকেই গ্রহণ করে নি কার্য্যতঃ। ফলে তাদের এই অধঃপতন।

দান্দ্বিক বস্তুবাদের বদলে ভাববাদ ও আধ্যাত্মবাদ

মার্কসবাদের দর্শন হল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। দর্শনের মূলনীতি ও সিদ্ধান্ত এক জিনিস নয়; পারিপার্শ্বিকের পরিবর্ত্তনে সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন হলেও মূলনীতির পরিবর্ত্তন নির্ভর করে প্রমাণসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সত্যের পরিবর্ত্তনশীলতার ওপর। তাই দেশ কাল পরিবেশের পার্থক্যের জন্য রাজনৈতিক সংগ্রাম কৌশল পরিবর্ত্তিত রূপ নিতে পারে বিভিন্নক্ষেত্রে কিন্তু দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ভাববাদ বা আধ্যাত্মবাদে পরিবর্ত্তিত হতে পারে না। অথচ পৃথিবীর অধিকাংশ সোস্যালিষ্টদলগুলি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে ত্যাগ করে ভাববাদকে গ্রহণ করেছে তাদের দর্শন হিসেবে। তাঁদের কারও কারও বক্তব্য সংক্ষেপে বললে দাঁড়ায়—আজও ভাববাদের যেহেতু গণমনের ওপর প্রচুর প্রভাব আছে সেই হেতু তার কার্য্যকারিতা অস্বীকার করবার উপায় নেই এবং তাই বস্তুবাদ ও ভাববাদের সমন্বয়ের মাধ্যমেই জগতের দার্শনিক দৈন্য দূর করতে হবে। এ ছাড়াও অন্যাংশ নিওকান্টবাদকেই গ্রহণ করেছে দর্শনরূপে। এই চিন্তাধারার আর যেখানে স্থান হক মার্কসবাদী শিবিরে যে স্থান হতে পারে না, সেকথা লেনিন বহু দিন আগেই তাঁর Materialism and Empirio-criicism বইয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন। ভারতবর্ষ আবার একটু বেশীরকম গুরুবাদী দেশ তাই ভারতবর্ষের সোস্যালিষ্ট পার্টি আর এক একধাপ এগিয়ে আধ্যাত্মবাদকেই সমর্থন করে। তাই জয়প্রকাশনারায়ণের নিজেকে মার্কসবাদী দাবী করেও বলতে লজ্জা করে না—"জাতির মনস্তাত্ত্বিক সংকটে শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীরামন মহর্ষি ও ডাঃ ভগবান দাসের মত আধ্যাত্মিক নেতাদের এক হয়ে দেশকে নেতৃত্ব দেওয়া উচিত" (দিল্লীতে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা)। আধ্যাত্মবাদ জাতির মনস্তাত্ত্বিক সংকট কাটাবে এ কথা ঝানু বুর্জোয়া দার্শনিকরা এই বিংশ শতাব্দীতে বলতে সাহস করে না অথচ সাম্রাজ্যবাদী জয়প্রকাশ তা সচ্ছন্দে প্রচার করছেন। ফ্যাসিবাদ হল আধ্যাত্মবাদ ও বিজ্ঞানের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ—"Fascism is a peculiar fusion of spiritualism with science" (Fascism and Culture—Com Shibdas Ghosh)। সোস্যালিষ্ট পার্টিগুলির থেকে এ বিষয়ে ফ্যাসিষ্টদের কোন পার্থক্য নেই।

শ্রেণী সমন্বয়ের কথা ফ্যাসিষ্টরাই বলে

সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষা হল এই যে, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিপ্লবী শ্রেণী সংগ্রামই হচ্ছে ইতিহাসের প্রকৃত চালক শক্তি। এই শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতার মধ্য দিয়ে এবং অবশেষে ধনিক শ্রেণীর পরাজয় ও বিপ্লবী শ্রেণীর জয়লাভের মারফৎ সমাজে সমাজ তন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু একথা জানা সত্ত্বেও সোস্যাল ডিমোক্র্যাটরা সমস্ত প্রগতিবাদী সামাজিক শক্তি বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণীকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে, পুঁজিবাদী সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গে সহযোগীতায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়। অর্থাৎ মার্কসবাদীরা যেখানে শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্রতর করে তাকে তার যুক্তিযুক্ত পরিসমাপ্তিবিপ্লবে রূপদিতে চেষ্টা করে সেখানে এই সব নামধারী সোস্যালিষ্টের দল শ্রেণী সংগ্রামকে ত্যাগ করে শ্রেণী সমন্বয়ের কথা বলে পুজিবাদকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। তা অবশ্য এরা করতে বাধ্য; কারণ এদের কাছে ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্র কোন গুণগত (qualitative) পরিবর্ত্তন নয়, পরিমাণ গত (quantitative) পরিবর্ত্তন মাত্র। ম্যাকডোন্যাল্ড সাহেবের "Socialism is not the uprising of a class; it is the social unity and growth towards organic wholeness"—এই কথায় বর্ত্তমান বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী এটলী সাহেব বলেছিলেন—"he is essentially a fascist" অথচ সেই এটলি সাহেবের উপদেষ্টা ডাঃ ডাল্টনের মতে এখন "Socialism is a quantitative thing" সোস্যালিজম কোন শ্রেণীর অভ্যুত্থান নয়, কোন গুণগত পরিবর্ত্তন নয়, সোস্যালিজম হল সামাজিক ঐক্যের প্রসার ও সমাজ দেহের সামগ্রিক বিকাশ অর্থাৎ সোজা কথায় পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার সংস্কার মাত্র। গান্ধীবাদ, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ আর ফ্যাসিবাদ এই তিনটি বাদই মালিক পক্ষকে জাতির অছি ঘোষণা করে শোষক ও শোষিত শ্রেণীর ঐক্য ও সমন্বয়ের কথা বলে। এই তিনটারই লক্ষ্য রাষ্ট্রীয় পুঁজির অগ্রগতি আর রাষ্ট্রীয় পুঁজির বিকাশ ফ্যাসিবাদকেই প্রতিষ্ঠা করে।

পুঁজিবাদীদের দালালরাই সর্ব্বহারার একনায়কত্বকে অস্বীকার করে

"It is a Common mistake these days to think that there must be dictatorship of the proletariat in a Socialist state" (My picture of Socialism—Jaya prakash)। তাত বটেই; ঐখানেই যে যত গোলমাল মার্কসের বহু আগেও বুর্জোয়া চিন্তানায়করা সমাজে শ্রেণী সংগ্রামের অস্তিত্ব মেনে নিয়েছে; কিন্তু তারা ভাবত, এই শ্রেণী বিভাগ ও শ্রেণী সংগ্রাম চিরন্তন। মার্কস প্রথম প্রমান করেন—সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব এবং শ্রেণী সংগ্রাম চিরন্তন নয়; ইতিহাসের গতিতে সমাজের

(৯ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

আজকের দিনে বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়নের কর্ত্তব্য

দুনিয়া জোড়া অর্থনৈতিক সংকট ক্রমে আরো প্রকট হয়ে তীব্ররূপ নিয়ে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে শ্রমজীবি শ্রেণীর ওপর পুঁজিপতিদের হিংস্র আক্রমণ। বেকারের সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, মেহনতী মানুষের জীবনযাত্রার মান ক্রমশঃ নামছে আর তাদের অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠার আগে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা চলেছে ফ্যাসিবাদী আক্রমণে। শ্রমিক শ্রেণীও এই আক্রমণের প্রতিআক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে, তবে অন্যান্য দেশে বিশেষ করে ফ্রান্স ইটালী প্রভৃতি দেশে যে ধরণের সংঘ শক্তির পরিচয় দিচ্ছে শ্রমজীবিশ্রেণী ভারতবর্ষে তার এক শতাংশও পরিচয় দিতে পারে নি সন্দেহ নেই। এই অসুবিধা স্বীকার করে নিয়েই আমাদের এগুতে হবে; কারণ দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আমাদের কাছে মুক্তির সুযোগ এনে দিতে খুব বেশী দেরী করবে বলে মনে হয় না। জাতীয় ক্ষেত্রে সে সুবিধা গ্রহণের উপযুক্ত হিসাবে যদি আমরা নিজেদের ইতিমধ্যে প্রস্তুত করে নিতে না পারি তাহলে বৃথাই যাবে সে সুযোগ। বাস্তব অবস্থা যতই আমাদের পক্ষে হক, ধনতান্ত্রিক সংকট যতই তীব্র হক—সমস্ত কিছুই ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমরা সে বাস্তব অবস্থার উপযোগী না হই, যদি অবস্থার চাপে যা লাভ করি তাকে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির কাজে লাগাতে না পারি।

ধনতান্ত্রিক সংকট বেড়ে চলেছে

পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী হল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র; কিন্তু তারও আজ নিস্কৃতি নেই ধনতান্ত্রিক সংকট হতে। মার্কিণ সরকারের নিজস্ব স্বীকৃতি থেকেই জানতে পারা যায় সংকট সেখানে কি রকম তীব্র রূপ ধারণ করেছে—বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে, অসংখ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ব্যবসা বন্ধ করে দিচ্ছে, শিল্পোৎপাদন ও বহির্বাণিজ্যের অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে চলেছে। ইতিমধ্যেই পূর্ণ বেকারের সংখ্যা সেখানে দাঁড়িয়েছে ৫ লক্ষ এবং শীঘ্রই তা ১০ লক্ষের মত দাঁড়াবে—এ বহির্বাণিজ্যকে ঠিক রাখা সম্ভব হচ্ছে না। ১৯৪৭ সালের তুলনায় তা বর্ত্তমান বছরে শতকরা ২৭ ভাগ কমেছে; এখনও আরও কমছে। এই অবস্থা শুধু মার্কিণ মুলুকেই সীমাবদ্ধ নেই; সারা ধনতান্ত্রিক দুনিয়াই এই সংকটে ভুগছে। গত বৎসরের তুলনায় ফ্রান্সে বেকারের সংখ্যা দেড় গুণ, ইঙ্গ-মার্কিণ অধিকৃত জার্ম্মাণ অঞ্চলে প্রায় দুই গুণ, নরওয়ে ও হল্যাণ্ডে দুগুণ, সুইৎসারল্যাণ্ডে তিনগুণের মত বেড়েছে। গ্রেটবৃটেনেও তাই।

ধনিকশ্রেণীর লাভের মাত্রা কোথাও কিন্তু কমেনি; বরং শিল্প মুনাফাসূচক সর্বত্রই বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে জীবন ধারণের খরচ অধিকতর ব্যয়বহুল এবং শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের প্রকৃত মজুরী কমে

লেখক—দুর্গা মুখার্জী
কেন্দ্রীয় কমিটীর সভ্য

কথা চেপে যাবার উপায় নেই। তার ওপর আছে ১ কোটি ৮০ লক্ষ অর্দ্ধ বেকার। যুদ্ধ পরবর্ত্তী সময়ের তুলনায় উৎপাদনও কমে চলেছে হু হু করে: এই বছরের দ্বিতীয় তৃতীয়াংশে প্রথম তৃতীয়াংশের তুলনায় শিল্পোৎপাদন গড়ে শতকরা দশ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। ইস্পাত, মোটর, জাহাজ, বস্ত্র—প্রত্যেকটি শিল্পেই উৎপাদন কম্‌তির দিকে; কোন কোনটিতে আবার হ্রাসের মাত্রা শতকরা ৩০ ভাগের মত। এত কম উৎপাদন সত্ত্বেও উৎপাদিত মাল বিক্রয় হচ্ছে না, গুদামে জমে যাচ্ছে ফলে হাজার হাজার শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাধ্য হয়ে ব্যবসা বন্ধ করছে আর তাতে বেকার সমস্যা আরও তীব্র রূপ ধারণ করছে। এক ১৯৪৯ সালের প্রথমার্দ্ধেই ৪৫৮১টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উঠে গিয়েছে। সাম্যবাদ বিরোধী যুদ্ধ শিবিরে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে টেনে এনে এবং মার্শাল প্ল্যানের ফাঁসে তাদের বেঁধে আমেরিকার কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও উৎপাদিত মাল কিনতে বাধ্য করিয়েও মার্কিণের

যাওয়ায় তাদের জীবন যাত্রার মান হীন হতে হীনতর হয়ে চলেছে। ১৯৪৮ সালের শেষে নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের পাইকারী মূল্যমানসূচক যুদ্ধ পূর্ব্ব বছরের তুলনায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ও গ্রেটবৃটেনে যথাক্রমে শতকরা ৯১ ও ৮৬ ভাগ চড়েছে। শ্রমিকের গড় আয় বেড়েছে শতকরা ২৫ ভাগ। সুতরাং তাদের দুঃখ দুর্দ্দশা বেড়েই চলেছে। গত বছর তার আগের বছরের তুলনায় গ্রেটবৃটেনের শিল্পপতিদের মুনাফা বেড়েছে শতকরা ১৮ ভাগ আর শ্রমিকের প্রকৃত মজুরী কমেছে শতকরা ৯ ভাগ। প্রত্যেকটি ধনতান্ত্রিক দেশেই এই অবস্থা চলছে; ভারতবর্ষ তার ব্যতিক্রম নয়। বরং সবল একচেটে পুঁজিবাদের দিনে ঔপনিবেশিক পুঁজি সবল হবার উদ্দেশ্যে অপেক্ষাকৃত বেশী তীব্রভাবে শোষণ চালায়। ভারতবর্ষে তাই দুর্ভোগ ও দুর্দ্দশার বোঝা তথাকথিত গণতান্ত্রিক ধনতান্ত্রিক দেশের চেয়ে অনেক বেশী করে পড়েছে জনসাধারণের মাথার ওপর।

শ্রমিকের আয় কমেছে অসম্ভবভাবে

অর্থনৈতিক সংকটকে ঢেকে রাখার উদ্দেশ্যে ধনিক শ্রেণী মুদ্রাস্ফীতির সাহায্য নেয় আবার মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পাবে—এই অজুহাতে শ্রমিকের মজুরীর ওপর আঘাত হানে। ফলে শ্রমজীবি অংশের জীবনে দুঃখ দুর্দ্দশার ভোগান্তি অসম্ভবভাবে বেড়ে যায়। যুদ্ধের শেষ থেকে ভারতীয় শ্রমজীবি অংশের প্রকৃত আয় কি ভাবে কমে চলেছে তার কিছুটা প্রমাণ মিলবে নীচে সরকারী হিসাব থেকে।

বেড়েছে? কিছুই বাড়েনি। কারণ চটকল, সূতাকল, খনি, চা বাগান, রেল ও সওদাগরী শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের দাবী দাওয়া বিচার করার জন্য যে সমস্ত সরকারী শালিসী বসে তার কার্য্যকারীতা ১৯৪৯ সালের গোড়ার দিক পর্য্যন্ত ছিল। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে শ্রমিকের এক পয়সাও মজুরী বৃদ্ধি করেনি মালিকপক্ষ; উপরন্তু নানা ছুতানাতায় তাদের মজুরী কেটেই নিয়েছে। শুধু তাই নয় সরকারী ট্রাইব্যুনাল পর্য্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল, তারা যে মজুরী বেঁধে দিয়েছিল সেটা তৎকালীন

প্রদেশ	বছর	মূল্যমান অনুযায়ী কত মজুরী হওয়া উচিত বৎসরে	প্রকৃত বাৎসরিক মজুরী	১৯৩৯ সালের তুলনায় প্রকৃত মজুরী কত কমেছে
বাংলা	১৯৩৯	২৪৮.৭	২৪৮.৭	×
	১৯৪৬	৬৪৯.১	৪৯৬.৩	শতকরা ২২ ভাগ কম
	১৯৪৭	৭২৬.২	৫৬৭.২	„ ২১.৮ „
বোম্বাই	১৯৩৯	৩৭০.৪	৩৭০.৪	×
	১৯৪৬	৮৮৪.৬	৮১২.৩	„ ৮.১ „
	১৯৪৭	৯৫২.৯	৯৭৭.৯	„ ২.৬ „
বিহার	১৯৩৯	৪১৫.৫	৪১৫.৫	×
	১৯৪৬	১২৪৫.	৫৪৪	„ ৫৭ „
	১৯৪৭	১৫২৭.৫	৮১৯.৪	„ ৩৯.৭ „
যুক্তপ্রদেশ	১৯৩৯	২৩৫.৮	২৩৫.৮	×
	১৯৪৬	৭৩৬.৫	৫৯৩.৬	„ ১৯.৪ „
	১৯৪৭	৮৭৩.৫	৮১৯.৪	„ ২৩ „

(লেবার ইয়ার বুক ১৯৪৬ হতে হিসাব)

নেতাদের স্বাধীনতা পাবার পর থেকে সরকারী কর্মকর্ত্তারা হিসাব দেয়নি কারণ তাহলে ধাপ্পা দেবার অসুবিধা কিছুটা হয়। তবুও দেখা যাক আসল অবস্থা কিছু বের করা যায় কিনা।

মূল্যমান অনুযায়ী যথেষ্ট কম। চটকল ট্রাইব্যুনাল রায়ের "ট্রাইব্যুনাল দেখেছে যে, বর্ত্তমান অবস্থায় জীবন ধারণের মোট খরচ দাঁড়ায় মাসে ৭১ টাকা ৮ আনা, কিন্তু বর্ত্তমানে সবচেয়ে কম মজুরীর অদক্ষ

পাইকারী দরের সর্বভারতীয় সূচক
(১৯৩৯ সালের আগষ্ট = ১০০)

বছর	খাদ্যশস্য	ডাল	অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য	সমস্ত খাদ্যদ্রব্য	কাপড়	সাধারণ সূচক
১৯৪৭এর গড়	৩১২	৪১১	২৩২	২৯২	৩১৪	২৯৭
১৯৪৮ জানুয়ারী	৩৮৪	৪৮৫	২৬৮	৩৪৮	৩৩২	৩২৯
১৯৪৮ ডিসেম্বর	৪৯০	৪৫৫	৩৬৪	৩৯৮	৪১২	৩৮৪

(ইণ্ডিয়ান লেবার গেজেট, ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯)

এ থেকে পরিষ্কার দেখা গেল ১৯৪৭ সালের তুলনায় ১৯৪৮ সালে জীবন ধারণের খরচ শতকরা ৩০ ভাগের মত বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই হিসাবে আয় কি

মজুরের মোট আয় হচ্ছে ৪৬ টাকা। এর ফলে শিল্পের ওপর বিপুল বোঝা চাপবে, (না মালিকের মুনাফা কমে যাবার ভয়ে লেখক) বিশেষ করে যখন নতুন সুখ

সংস্কারবাদ ও অতিবিপ্লবী বিচ্যুতিকে খতম করা

সুবিধার ব্যবস্থা করতে গিয়ে তার ওপর অতিরিক্ত বোঝা চেপেছে। তাই ট্রাই ব্যুনাল সুপারিশ করছে যে ৪৬ টাকার সঙ্গে পার্থক্যের অর্দ্ধেক অর্থাৎ সাড়ে ১২ টাকা হারে মজুরী বাড়ান উচিত"—এই স্বীকৃতি তার প্রমাণ।' এই ভাবে গোড়াতেই ন্যায্য মজুরী দেওয়া হয় নি, তার ওপর ট্রাইব্যুনাল চলার সময়ের মূল্যমান সূচক অপেক্ষা আজ তা অনেক বেড়েছে এবং এখনও বেড়ে চলেছে। সে সব কথা ধরলে প্রকৃত মজুরী ১৯৪৭ সালের তুলনায় কত কমেছে তা পরিষ্কার হবে।

ছাঁটাই হচ্ছে নির্বিচারে

শ্রমিকের এই মজুরী হ্রাসের সঙ্গে হাজার হাজার শ্রমিক ও কর্মচারীকে ছাঁটাই করে চলা হচ্ছে। যুদ্ধের সময়ে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে মোট চাকরী জীবীর সংখ্যা ছিল ২৪ লক্ষ ৪০ হাজার আর স্বাধীন ভারতে ১৯৪৭-৪৮ সালে কমে দাড়িয়েছে ২২ লক্ষ ৩৫ হাজার। এর মধ্যে সরকারী বিভাগগুলির অবস্থাই সবচেয়ে খারাপ। অডিন্যান্স কারখানা গুলিতে মোট কর্মচারীর শতকরা ২৪·২ ভাগ, এইচ, এম, আই ডকে শতকরা ২৯·৫ ভাগ ছাঁটাই করা হয়েছে; রেলে ৫০ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই হতে চলেছে, ডাক, তার বিভিন্ন সরকারী বিভাগে হাজারে হাজারে ছাঁটাই হচ্ছে। ফলে বেকারের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল এই তিন বছরের মধ্যে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে চাকুরীর জন্য নাম লিখিয়েছে ২০ লক্ষ ৭১ হাজার; তাদের মধ্যে চাকুরী পেয়েছে মাত্র ৫ লাখ। সুতরাং সরকারী হিসাব মতেই বেকারের সংখ্যা এখন ১৫ লাখের বেশী। এটা সম্পূর্ণ হিসাব হতেই পারে না কারণ হাজার হাজার এমন লোক আছে যারা নাম লেখায় নি। তার ওপর এই সংখ্যা বেড়েই চলেছে প্রতি মাসে। চটকল গুলিতে সম্প্রতি যে ৩৩ হাজারের মত ছাটাই হয়ে গেল, আরও যে ৫০ হাজারের মত ছাটাই হতে চলেছে তার কথা এতে ধরা হয় নি। আমেদাবাদের ৪টি সুতাকল বন্ধ হয়েছে, কোয়েম্বাটুরে ১০ হাজার শ্রমিক ছাটাই হয়েছে, আসামে ৭৫টি কারখানার মধ্যে ২৪টি লালবাতি জ্বেলেছে, আজমীর মারওয়াড়ে ৪২টি রেজেষ্ট্রীকৃত কারখানার মধ্যে মাত্র ৩০টিতে কাজ চালু আছে, যুক্তপ্রদেশ ও বোম্বাইয়ে যথাক্রমে ১২৬ ও ৪৯৯টিতে কোন কাজ হচ্ছে না। ১৯৪৮ সালের পর এই অবস্থা। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় যে বেকার সমস্যা কি ভীষণ ভাবে বিরাজ করছে তা বলে বোঝাতে হবে না। এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে পিতা পুত্রকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে নিষ্কৃতি খোঁজে ভরণ পোষণে অক্ষম হয়ে (রাজকোটে) মাতা কন্যাকে পণ্য হিসাবে বিক্রয় করতে বাধ্য হয় (রাণাঘাটে),—চাকুরী জোগাড় করতে অক্ষম যুবক আত্মহত্যা করে সমস্যার সমাধান করে (সুরেন পাল)।

শ্রমের পরিমাণ বাড়ান হচ্ছে

শ্রমিকদের শোষণ করার একটা উপায় হচ্ছে তাদের শ্রম-ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়া, তাদের দিয়ে বেশী কাজ করিয়ে নেওয়া। ভারতীয় শিল্পপতির দল তা ভালভাবেই করে চলেছে। একদিকে হাজারে হাজারে শ্রমিক ছাটাই করা হচ্ছে অন্যদিকে কম শ্রমিক দিয়ে বেশী কাজ তুলিয়ে নেওয়া হচ্ছে। রেলওয়ে অনুসন্ধান কমিটি সুপারিশ করেছে রেলে শ্রমিক ছাঁটাই করে ঘণ্টা প্রতি আরও বেশী কাজ তাদের দিয়ে করিয়ে নেওয়া হক। সর্বত্রই প্রায় রেসানালাইজেসন প্রথা চালু করা হয়েছে এবং ভারতীয় পুঁজিবাদী সরকার ট্রাইব্যুনালের মারফৎ শিল্পপতিদের এই অধিকার দিয়ে চলেছে।

গুলি, গ্রেপ্তার ও জুলুমের বন্যা

এই সমস্ত অত্যাচারের প্রতিবাদে যেখানেই প্রগতিবাদী জনতা এগিয়ে এসেছে সেইখানেই চলেছে নির্মম পুলিশী জুলুম। গ্রেপ্তার ও বিনা বিচারে আটকের ব্যাপারে দমন নীতি এতই চূড়ান্ত হয়েছে যে ২৫ হাজার শ্রমিক কৃষক কর্মী আজ কারাগারের অন্তরালে, অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষ শ্রমিককে হত্যা করা হয়েছে এবং বহু ক্ষেত্রে আইনসঙ্গত ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার পর্য্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

পুঁজিপতিদের মুনাফা বেড়েই চলেছে

একদিকে শ্রমিক শ্রেণীর ওপর এই অত্যাচার অন্যদিকে শিল্পপতিদের প্রতি অকৃপণ করুণা বর্ষণ যাতে তারা মোটা মুনাফা লুঠতে পারে তার চেষ্টা চলেছে। পুঁজিপতিদের মুখপত্র বিড়লার ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট তার ১৯৪৮ সালের বার্ষিক সংখ্যায় যে হিসাব দাখিল করেছে তাকেও যদি ঠিক বলে ধরা হয় তাহলে দেখা যাবে কি প্রচুর লাভ করেছে পুঁজিপতির দল।

শিল্পে মুনাফাসূচক

(১৯২৮ সালে = ১০০)

বছর	চটকল	সুতাকল	চা	লোহা ইস্পাত	কয়লা	চিনি	সমস্ত শিল্প মিলিয়ে
১৯৩৯	১৩৬	১৫৪·৫	৯৬·২	২৮৯·৩	১৩৯·১	১৭৯·৪	৭২·৪
১৯৪৬	৫৮·১	৬৮০·৫	১৯০·৪	৩২৪·৭	২৭৮·	১৭৫	১৫৯·৪

শর্করা শিল্প সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে তা সর্বৈব মিথ্যা কারণ সম্প্রতি বোম্বাই প্রদেশে চিনির পাইকারী দাম ঠিক করার জন্য যে সভা হয়েছিল তার আলাপ আলোচনা থেকেই জানা গিয়েছে যে, এই শিল্পটিতে প্রচুর লাভ হয়েছে আগে। আর এখন যে কি পরিমাণ হচ্ছে তার সম্বন্ধে একটুখানি আলো পাওয়া যাবে সরকার ও চিনি ব্যবসায়ীদের এত গোপনতা সত্ত্বেও এই ব্যাপার থেকে যে, এই বছরের জুলাই আগষ্ট মাসে তাদের লাভ হয়েছে সাড়ে ৩ কোটি টাকা এবং অক্টোবর মাসে আড়াই কোটির মত। অর্থাৎ তিন মাসেই মুনাফা লুঠেছে ৬ কোটি টাকা ভারতবর্ষের চিনির রাজারা। আর এ ব্যাপার শুধু চিনিতেই নয়; প্রত্যেকটি শিল্পেই লাভ বেড়ে চলেছে। ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ সালে যে মুনাফা আরও বেড়েছে তা সুতাকলগুলির দাখিলীকৃত হিসাবও প্রমাণ দেবে।

শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিরোধ

শ্রমিক শেণীর ওপর এই নিষ্পেষণকে শ্রমিক শ্রেণী সহজে মেনে নেয়নি। এর প্রতিরোধে তারা নেমেছে; ধর্মঘট করেছে, প্রাণ দিয়েছে আবার অনেক ক্ষেত্রে আত্মসমর্পনও করেছে। কয়েক বছরের ধর্মঘটের হিসাব দেখলে বোঝা যাবে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের চরিত্র।

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

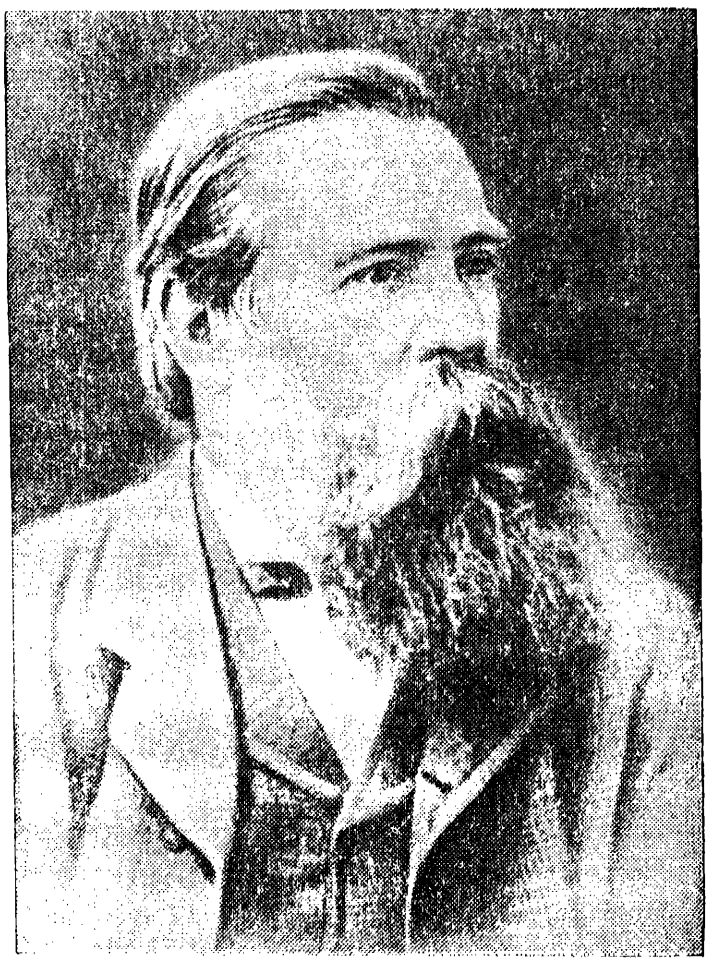

"...the indifference towards all theory...is one of the main reasons why the English labour movement moves so slowly in spite of splendid organization of the individual unions"—Engels.

কংগ্রেস ও জয়প্রকাশীদলের প্রভাব মুক্ত করতে না পারলে বাঁচার উপায় নেই

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

যুদ্ধের সময়ে ও পরে ভারতে ধর্মঘটের হিসাব

বছর	ধর্মঘটের সংখ্যা	কত শ্রমিক যোগ দিয়েছিলে	কত রোজ নষ্ট হয়েছে
১৯৪০	৩২২	৪,৫২,৫৩৯	৭৫,৭৭,২৮১
১৯৪২	৬৯৪	৭,৭২,৬৫৩	৫৭,৭৯,৯৬৫
১৯৪৫	৮২০	৭,৪৭,৫৩০	৪০,৫৪,৪৯৯
১৯৪৬	১৬২৯	১৯,৬১,৯৪৮	১২৭,১৭,৭৬২
১৯৪৭	১৮১১	১৮,৪০,৭০৪	১৬৫,৬২,৬৬৬
১৯৪৮	১৬৩৪	১৩,১৮,২২২	৮০,৩৭,৫৩২

(ইণ্ডিয়ান লেবার গেজেট, মার্চ, ১৯৪৯)

ধর্মঘটের চরিত্র

গত বছরের ধর্মঘটগুলির চরিত্র বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে। কারণ অনেকেই বলতে আরম্ভ করেছে, "ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর মনে নিরাপদ জীবনযাত্রার কোন মোহ আর নেই, গভর্ণমেণ্টের দমননীতির প্রতি কোন ভয় নেই, কারণ জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে অতি দ্রুত শেখাচ্ছে যে, অতি ছোট কোন দাবী বা অধিকার আদায় করতে বা বজায় রাখতে হলে তাকে তীব্র কঠোর শ্রেণী সংগ্রাম করতে হবে।" অর্থাৎ ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণী বিপ্লবী শ্রেণীসচেতনতা লাভ করে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আক্রমনাত্মক সংগ্রাম করছে। এই বিশ্লেষণ মারাত্মক ভুল। কারণ শ্রমিকের সংগ্রাম যদি আক্রমনাত্মকই হত তাহলে ধনিক শ্রেণীর অবস্থা হত আত্মরক্ষামূলক। আর ধনিক শ্রেণী আত্মরক্ষায় ব্যস্ত থাকলে, মজুরী হ্রাস, শ্রমবৃদ্ধি, ছাঁটাই, নিষ্পেষনের মাত্রা এ ভাবে চালাতে সক্ষম হত না। উপরন্তু ধর্মঘটে লিপ্ত শ্রমিকের সংখ্যা এবং তার সঙ্গে শ্রমদিন নষ্টের তুলনা করলে পরিষ্কার বোঝা যাবে ধর্মঘটগুলি দীর্ঘদিন স্থায়ী হতে পারে নি। এর কারণ হয় তাড়াতাড়ি শ্রমিকের দাবী স্বীকৃত হয়েছিল নয় ধর্মঘটগুলি সফল হবার আগে ভেঙ্গে গিয়েছিল বা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল প্রথমটা ঠিক হলে শ্রমিকের মজুরী হ্রাস, ছাঁটাই প্রভৃতি হতেই পারে না কারণ ঐ গুলির বিরুদ্ধেই যে সংগ্রাম। সুতরাং স্বীকার না করে উপায় নেই ধর্মঘটগুলি অধিকাংশ সফল হয় নি। তাহলে কি বলতে হবে এখন শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামে শুধু পিছু হটার পর্ব? না তাও নয় কারণ এ মতবাদও অত্যন্ত বিপজ্জনক যেহেতু সংকটের যুগে তাহলে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম অসম্ভব—এই কথাটাই মেনে নেওয়া হয়। আক্রমনাত্মক না আত্মরক্ষামূলক এই ভাবে বিষয়টাকে সাধারণভাবে ফেলতে গেলে ভুল হবে। তবে সাধারণভাবে বললে বলা যেতে পারে—ধনিক শ্রেণী চিরকালই চায় তার অবস্থা যেন খারাপ না হয়, পুঁজিবাদ আরও শক্তিশালী হক, মেহনতকারী জনতার মজুরীর দাসত্ব চিরস্থায়ী হক। আর এই উদ্দেশ্যে সে শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান কমিয়ে এবং বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনকে চূর্ণ করে দেয়। বর্ত্তমান চূড়ান্ত শ্রেণী সম্পর্কের দিনে প্রত্যেক দেশের পুঁজিবাদীশ্রেণীর ফ্যাসিবাদী না হয়ে উপায় নেই। তাই এক তরফা চার্চিলীয় শোষণনীতির আশ্রয় এরা নেয় না। পরিবর্ত্তে ফ্যাসিবাদ আজ বুঝেছে বিপ্লবের প্রধান শক্তি, শ্রমিক শ্রেণীকে বিপ্লব হতে দূরে রাখতে হলে তাকে ফ্যাসিষ্ট সংঘ শক্তির অধীনে টেনে আনতে হবে। এই উদ্দেশ্যে ভয় দেখিয়ে কাজ সারার জন্য সন্ত্রাসবাদী শাসনের আশ্রয় গ্রহণ করছে নানা গণতন্ত্র বিরোধী আইন প্রনয়ন করে অন্যদিকে যে সমস্ত বামপন্থীদল ট্রেড ইউনিয়নকে বিপ্লবী আন্দোলনের শিক্ষাক্ষেত্র বলে মনে করে তাদের দ্বারা পরিচালিত প্রত্যেকটি ধর্মঘটকে জোর করে ভেঙ্গে দিচ্ছে বামপন্থী দলগুলির ওপর শ্রমিক শ্রেণীর আস্থা কমাবার জন্য এবং শ্রমিক শ্রেণীর নিজের সংগঠন ও শ্রেণী শক্তির ওপর বিশ্বাস নিশ্চিহ্ন করার জন্য। এই প্রথায় অনেকটা সফল হয়েছে বলে বহু শ্রমিকই ভয়ে ফ্যাসিষ্ট শ্রমিক সংঘে যোগ দিচ্ছে উপরন্তু দুর্বল ও পরাজিত মনোভাব সম্পন্ন শ্রমিকের কাছে আই. এন. টি. ইউ সির মারফৎ শালিসীর মাধ্যমে কোথাও কোথাও তাদের দাবীর সামান্যতম অংশ মিটিয়ে দিয়ে আবার কোথাও দাবী মিটিয়ে দেবার অভিনয় করে তাদের ওপর নেতৃত্ব কায়েম রাখতে চেষ্টা করছে। তবুও ধর্মঘট হচ্ছে তার কারণ বামপন্থী দলগুলি এখনও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করছে শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী সচেতনতা বাড়াতে। আর ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্র ধর্মঘটগুলিকে সে কাজে ব্যবহার করতে দিতে নারাজ বলে সেগুলি ভেঙ্গে দিচ্ছে জোর করে। সংগ্রামের মারফৎ কিছু শ্রমিক যেমন অধিকতর শ্রেণী সচেতন হচ্ছে তেমনি আবার বেশ কিছু অংশ ভয়ে কিংবা আপতলাভের আশায় ফ্যাসিষ্টদের কবলে পড়ছে।

আজকের দিনের কর্ত্তব্য

ফ্যাসিষ্টরা ত চাইবেই বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণী হতে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে। কিন্তু তারা চাইলেই আমরা তা মেনে নিতে পারি না। কারণ বিপ্লবের প্রধান তম শক্তি হল সমাজতান্ত্রিক শ্রেণী সচেতন শ্রমিক। উপরন্তু যেহেতু শ্রমিকের শ্রেণী সচেতনতা বাড়াবার সবচেয়ে সোজা উপায় হচ্ছে তার দৈনন্দিন সমস্যা নিয়ে সংগ্রাম সেইহেতু পুঁজিবাদী ফ্যাসিবাদীরা শ্রমিকের ধর্মঘটে হাজার রকম বাধার সৃষ্টি করবে এবং বিশেষ করে তবুও যদি ধর্মঘট হয় তাহলে সেই সমস্ত ধর্মঘটের সংস্পর্শে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর দল যাতে আসতেই না পারে তার পাকা ব্যবস্থা করবে। তাছাড়া শ্রমিকের মনোবল ভাঙ্গার জন্য অসময়ে সংগ্রামে নামিয়ে দেওয়া, ভুল দাবীর ওপর সংগ্রাম আরম্ভ করা, সংস্কারবাদের বেড়াজালে বেঁধে রাখা—এ সব ত আছেই। অথচ এ গুলিকে আমাদের কাটাতেই হবে। এখন প্রশ্ন এ গুলিকে আমরা কাটাব কেমন করে?

শ্রমিকের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে শিল্পোন্নতির চেষ্টা এবং অর্থনৈতিক সংকট ক্রমশ তীব্রতর হওয়ার দরুন শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট বেড়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। তবে এই সংঘর্ষ যাতে বুর্জোয়া সংস্কারবাদের গণ্ডী ছাড়িয়ে না যেতে পারে তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে ফ্যাসিষ্ট শ্রমিক সংঘ আই. এন. টি. ইউ. সি ও ফ্যাসিষ্টদের দালাল নামে সোস্যালিষ্ট শ্রমিক সংগঠন হিন্দু মজদুর সভা। সুতরাং এদের নেতৃত্বের বাইরে শ্রমিককে নিয়ে আসতে না পারলে ধর্মঘটে সফল হবার কোন সম্ভবনা নেই, শ্রমিককে রাজনৈতিক জ্ঞান সম্পন্ন করে গড়ে তোলার উপায়ও নেইই। সুতরাং যে সমস্ত শ্রমিক পুঁজিবাদী শ্রেণীর আওতায় পড়েছে তাদের তা থেকে বাইরে টেনে আনার জন্য এই সব সংস্কারপন্থী ইউনিয়ন ও ফ্যাসিষ্ট ইউনিয়নগুলির মধ্যে আমাদের দ্রুত অথচ তীব্র কাজ করে যেতে হবে। প্রতিক্রিয়াশীল ইউনিয়নগুলির মধ্যে থেকে ইউনিয়নগুলির প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে শ্রমিক শ্রেণীকে আসল বিষয় বোঝাবার চেষ্টা করা যেতে পারে সফলভাবে আর তা না করে বাইরে থেকে যতই "নেতারা দালাল," "নেতারা শ্রমিককে ভুল পথে চালাচ্ছে"—এই ধরণের কথা প্রচার করা হক ফল তাতে তত হবে না। প্রতিক্রিয়াশীল ইউনিয়নের ভিতর হতেই প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম—এই হবে কৌশল। এ কথাও ঠিক, সংস্কারপন্থী বা ফ্যাসিষ্ট নেতৃবৃন্দ এ সুযোগ নিতে দেবে না ইউনিয়ন থেকে বের করে দেবার চেষ্টা করবে। কিন্তু আমাদের শক্তিও কম নয় বিশেষ করে সংস্কারবাদীদের তারা যে স্থান অধিকার করে আছে সেখান হতে তাড়ান, যে সমস্ত শ্রমিক এখনও প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের অনুগমন করে তাদের জয় করা প্রতিবিপ্লবীদের হাত হতে ইউনিয়নের নীচের স্তরগুলি বের করে আনা, এবং সুবিধাবাদী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জনগণের বিক্ষোভ প্রজ্বলিত করার সুযোগ যখন এতেই মিলবে তখন অসুবিধা হলেও এই ভাবে কাজ করে যেতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত কোন শিল্প আছে—যেমন কলকাতার আশেপাশে পাট শিল্প—সেখানে আঞ্চলিক ভিত্তিতে একই শিল্পের শ্রমিকদের নিয়ে মজুর কমিটি গঠন করে তার মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রচার, ইউনিয়নের কি কি কাজ হওয়া উচিত, সংগ্রাম কেমন করে পরিচালিত করতে হবে, প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস কি কি আছে, সংগ্রামে জিততে হলে কেন এবং কেমন করে এই সব নেতাদের সরিয়ে দিয়ে নেতৃত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিতে হবে প্রভৃতি বিষয়ে শ্রমিকদের মধ্যে জোর প্রচার চালাতে হবে। এই কাজে সফলতা লাভ করতে পারলে শ্রমিকের ওপর রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা অনেক সহজ হয়। অনেকের ধারণা এই মজুর কমিটিগুলির বুঝি ইউনিয়নের অর্থ নৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে কোন যোগ থাকবে না। ইউনিয়নের নেতৃত্ব আমাদের হাতে থাকলে এই ধরণের মজুর কমিটীর ততটা প্রয়োজন থাকে না কিন্তু যেহেতু তা নয় এই মজুর কমিটিগুলিকে জঙ্গী কমিটিতে পরিণত করতে পারলে তারাই প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বকে সরিয়ে দিয়ে নেতৃত্ব নেবে।

কোন শিল্পে শ্রমিকের অসন্তোষ অথবা মালিকের আক্রমন ইচ্ছার প্রথম পরিচয়েই আসন্ন সংগ্রামের প্রশ্ন স্পষ্টভাবে শ্রমিকের সামনে উপস্থাপিত করতে হবে। ধর্মঘটের সময় এমন অনেক অদলীয় নেতা আছে যাদের ধর্মঘটের পেছনে টেনে আনা যেতে পারে। এক কথায় সমস্ত ফ্যাসিষ্ট ও আধাফ্যাসিষ্ট সোস্যাল ডিমোক্র্যাটদের সঙ্গে এদের দালাল বলে উড়িয়ে না দিয়ে শ্রমিকস্বার্থে এদের ব্যবহার করে নিতে হবে

তারপর বিপ্লবী পন্থা বলতে এমন দাবী বোঝায় না যা শ্রমিকরা পেতে পারে না বলে মনে করে, বা এতে এমন কথাও বোঝায় না যে দৈনন্দিন ধর্মঘটের ডাক

(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়)

দিতে হবে. প্রস্তাবের আগেই ধর্মঘটে নেমে পড়তে হবে, কিংবা যে ধর্মঘট আরম্ভ হয়েছে তাকে কবরস্থানে পাঠিয়ে ছাড়তে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে আলাপ আলোচনার স্থান আছে। তবে তাকে কাজে লাগাতে হবে শ্রমিকের মনোবল বুঝে, অবস্থা অনুযায়ী দাবীর বৃহত্তম অংশ আদায় করার কাজে। অর্থনৈতিক দাবীগুলিকে স্পষ্ট ও শ্রমিক শ্রেণীর বোধগম্য ও বাস্তব অবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগ সম্পন্ন করতে হবে এবং এ গুলি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চালাতে হবে।

ধর্মঘটের আগেই যদি লক আউটের সম্ভাবনা দেখা দেয় তাহলে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য জঙ্গী কমিটি গঠণ করতে হবে কারখানার সমস্ত শ্রমিকের ভোটে। তারপর অবস্থা ধর্মঘটের অনুকূলে হলে এবং শ্রমিকদের মধ্যে জঙ্গী মনোভাবের পরিচয় পেলে সমস্ত শ্রমিকের ভোটে ষ্ট্রাইক কমিটি নির্বাচিত করতে হবে। এই ষ্ট্রাইক কমিটি গঠনের কাজে যাতে প্রতিটি শ্রমিক যোগ দেয় এবং যাতে দোদুল্যমান মনোভাব সম্পন্ন শ্রমিক কিংবা প্রতিক্রিয়াশীল নেতারা এতে স্থান না পায় তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের এই ভাবেই কাজ করতে হবে যাতে প্রত্যেকটি দাবী, জঙ্গী কমিটি গঠনের দাবী, অর্থনৈতিক দাবী, সাধারণ শ্রমিকদের মধ্য থেকেই ওঠে। তারপর এই সমস্ত জঙ্গী কমিটিগুলি যাতে সাধারণ শ্রমিক হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে কিংবা আমলাতান্ত্রিক মনোভাব সম্পন্ন হয়ে না ওঠে তার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। বিশেষতঃ যে সমস্ত শ্রমিক ধর্মঘটে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে তাদের ও নিয়ে নিতে হবে ষ্ট্রাইক কমিটিতে। এই ভাবে আন্দোলন চালিয়ে যদি আমরা কাজের ভিতর দিয়ে শ্রমিকদের কাছে প্রমাণ করতে পারি আমরা শুধু ভাল বিপ্লবী নয়, শ্রমিকের অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া আদায়ের ব্যাপারেও ভাল যোদ্ধা আর সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাগত ক্ষেত্রে জোর প্রচার চালিয়ে যাই তাহলে বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে শ্রমিক আন্দোলনে যে ভাটা পড়েছে, প্রতিক্রিয়ার যে শক্তি বেড়েছে তাকে নস্যাৎ করে দিতে সক্ষম হব। সংস্কারবাদ নয়, অতি বিপ্লবী বিচ্যুতি ও নয়—এ হবে দৃষ্টিভঙ্গি।

সর্বশেষ কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় হল শ্রমিকের মধ্যে অবিরত রাজনৈতিক প্রচার। ট্রেড ইউনিয়নগুলি হচ্ছে শ্রমিক সাধারণের সঙ্গে মেশবার প্রশস্ততম ক্ষেত্র। বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর দল ট্রেড ইউ নয়নের মধ্যে কাজ করে শুধু শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া আদায়, ফ্যাক্টরী আইন সংশোধন করা প্রভৃতি আপাত সুখসুবিধার জন্য নয়। তার উদ্দেশ্য হল বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ ও শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র কায়েম করা। অথচ যেহেতু শ্রেণী সচেতন শ্রমিক শ্রেণীই হচ্ছে বিপ্লবের প্রধান শক্তি সেইহেতু সে ট্রেড-ইউনিয়নের মধ্যে কাজ করে, সংস্কারবাদী আন্দোলন করে বৃহত্তর ভাবে শ্রমিকের সঙ্গে মেশবার সুযোগ তাকে বিপ্লবী শ্রেণী সচেতন করার জন্য, তাকে বিপ্লবী নেতৃত্বের অধীনে টেনে আনার জন্য। এদিকে লক্ষ্য না রেখে বিপ্লবী দলের ট্রেড-ইউনিয়নের মধ্যে কাজ করার কোন অর্থ নেই; অথচ অতীতে আমরা তাই করেছি। এই ভুল আমাদেরই শোধরাতে হবে। এতদিনের জমা ভুল শোধরাতে গিয়ে একপক্ষ আবার অতি বিপ্লবী হয়ে ধ্বংস ডেকে আনছে। দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী এই দুই বিচ্যুতিকে রুখতে হবে। এই সঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার শুধু ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শ্রমিককে বিপ্লবী শক্তিতে পরিণত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়; তার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলন দরকার। তাই কোন বিপ্লবী দলের শ্রমিক আন্দোলন শুধু ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এই রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা করার চেষ্টা করতে হবে মজুর কমিটিগুলির মারফৎ। জনতা নিজের অভিজ্ঞতার মারফৎ বিপ্লবের অপরিহার্য্যতা না বুঝলে বিপ্লব হতে পারে না। আজও শ্রমিক শ্রেণীর কংগ্রেস ও সোস্যালিষ্ট পার্টি সম্বন্ধে মোহমুক্তি ঘটেনি; সেই মোহমুক্তি ঘটাবার কাজ করতে হবে এই কমিটিগুলির। বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীর এই হল বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য।

বাঁচতে হলে সোস্যাল ডেমোক্রেসিকে খতম করতেই হবে

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

উৎপাদন শক্তি যখন এক বিশেষ অবস্থায় আসে যখন উৎপাদন যন্ত্রের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তখন থেকেই সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী দেখা দেয়। এই শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শাসক শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থকে রক্ষা করার জন্যই জন্ম নেয় রাষ্ট্র। সুতরাং রাষ্ট্র "সমস্ত শ্রেণী স্বার্থের উর্দ্ধে এক সংগঠন" এ চিন্তাও ভুল; রাষ্ট্র হল শ্রেণীশাষণের যন্ত্র, এক শ্রেণী কর্ত্তৃক অন্য শ্রেণীকে অধীনস্থ রাখার হাতিয়ার। বুর্জোয়া রাষ্ট্র তার শাসন যন্ত্র পার্লামেন্ট, রিপাব্লিক, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র যে রূপই নিক না কেন তা মূলতঃ বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কত্ব। শ্রমিক শ্রেণী যখন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের উচ্ছেদ করে তার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে তখন তাকে সর্ব্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা না করে উপায় নেই কারণ এই একনায়কত্বের জোরেই কেবল মাত্র সে পরাজিত বুর্জোয়া শ্রেণীকে শাসন করতে পারে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত এইসব গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা গণতন্ত্রের মহিমা প্রচারে ব্যস্ত। অথচ কেনা জানে "to speak of democracy in general is nonsense and only the bourgeois hirelings can speak of it"। সুতরাং বর্ত্তমান শ্রেণী বিভক্ত সমাজে রাষ্ট্র লৌকিকভাবে সকলের সমান অধিকার স্বীকার করে নিলেও কার্য্যতঃ তা শ্রেণী শাসন হতে বাধ্য। সুতরাং গণতান্ত্রিক সমাজবাদী সেজে। এরা হল গণতন্ত্রও শ্রেণীগণতন্ত্র না হয়ে পারে না। সামন্ততন্ত্রের ধ্বংস থেকে শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্য্যন্ত এই সমস্ত পর্বটাই গণতান্ত্রিক যুগ। তার মধ্যে প্রথমাংশ যতদিন বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কত্ব চলে তাকে বলা হয় বুর্জোয়া গণতন্ত্র আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সর্বহারার একনায়কত্বের আমলকে বলে সর্ব্বহারার গণতন্ত্র। এ কথা ভুলে শুধু পবিত্র গণতন্ত্র-গণতন্ত্র বলে চেঁচালে ধাপ্পা দেওয়া হয়; পবিত্র গণতন্ত্র আর সোনার পাথর বাটী একই কথা—ও দুটার কোনটারই অস্তিত্ব নেই। এই সব কথা কমরেড লেনিন ব্যাখ্যা করেই বলেছেন—"Only he is a Marxist who extends the acceptance of the class-struggle to the acceptance of the dictatorship of the proletariat. This is the touchstone on which the real understanding and acceptance of Marxism should be tested" (The State and Revolution-Lenin)।

ফ্যাসিবাদের শেষ ও কৌশলী হাতিয়ার সোস্যাল ডিমোক্র্যাসি

তাহলে আসলে এরা কি? বুর্জোয়া উদারনৈতিকবাদ (liberalism) প্রচ্ছন্নভাবে এই রকম করেই বাঁচতে চেয়েছে বুর্জোয়া শ্রেণীর এক অংশ; শুধু অংশ নয়, সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও কৌশলী অংশ। দীর্ঘদিন শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার ফলে এরা পরিষ্কার ভাবে দেখতে পারছে ইতিহাসের ইঙ্গিত--ধনতন্ত্রের অবসান। তাই কৌশলে তাকে শেষ রক্ষার চেষ্টা করে চলেছে তারা। সেই কৌশল হচ্ছে ফ্যাসিবাদের কৌশল। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে উৎপাদন ব্যবস্থার অরাজকতার জন্য যে বিপর্য্যয় বার বার ঘটে ফ্যাসিষ্টরাষ্ট্রে তাকে কমাবার চেষ্টা করা হয় প্রথমতঃ শিল্প বাণিজ্যকে আংশিক জাতীয় করণ করে পুঁজিপতিদের নিজেদের মধ্যেকার প্ল্যানিংহীন প্রতিযোগীতাকে দূর করে দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের কেন্দ্রী করণের মারফত। এ দুটাই এই গণতান্ত্রিক সমাজবাদীদের লক্ষ্য। ফ্যাসিষ্টদের দর্শন হল, বিজ্ঞান বিরোধী আধ্যাত্মবাদ, উগ্রজাতীয়তাবাদ ও পচা জাতীয় ঐতিহ্যের revivalism। গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা এর সব কটারই যোগ্য উত্তরাধিকারী। সর্ব্বশেষে ফ্যাসিষ্টরা যেমন জনতার রাজনৈতিক অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিপ্লবী অংশ, শ্রমিক শ্রেণীকে বিপ্লবী আন্দোলন থেকে দূরে রাখে ফ্যাসিষ্ট শ্রমিক সংঘ গড়ে, মিথ্যা লড়াই এর মহড়া দিয়ে জনতার বিশ্বাস অর্জন করে এবং যে কোন বিপ্লবী আন্দোলনকে জাতীয় স্বার্থ বিরোধী আখ্যা দিয়ে নির্ম্মমভাবে নিশ্চিহ্ন করে এই সব সোস্যাল ডিমোক্র্যাটের দলও সবগুলিই ঠিক তেমনি ভাবে করে। আসলে তাহলে এই সব গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা ক্ষমতা দখলের আগে সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব কথা আর বড় বড় বুকনি ঝাড়লেও ".. as soon as they test power they become Social fascists. Same is the case with our JayaPrakashi Socialists. If they can capture power, the present loose capitalist state of India will be reorganised in a practical fascistic manner when they will be Social Fascists" (Social Democray and Fascism—Com Shibdas Ghosh)।

বাঁচতে হলে এদের রুখতে হবে

সুতরাং শুধু কংগ্রেসী ফ্যাসিবাদকে রুখলেই বাঁচা যাবে না; সোস্যাল ডিমোক্র্যাসিকেও রুখতে হবে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই কেবলমাত্র শোষিত মেহনতী মানুষ মানুষের মত বাঁচতে পারে। কিন্তু তারজন্য দরকার সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানের মারফত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের উচ্ছেদ। সে কাজ অসম্ভব যদি সোস্যাল ডিমোক্র্যাটবাদ খতম করতে না পারা যায়। এই কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থেকে ভারতীয় মজুর, চাষী, নিম্নমধ্যবিত্তের দলকে এগুতে হবে।

বাংলার গরীব চাষী আর

লেখক—হীরেন সরকার

কেন্দ্রীয় কমিটীর সভ্য

আমাদের দেশের চাষীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে কংগ্রেসী সরকার। আজ সে জমি থেকে উৎসন্ন তার পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই, রোগে ঔষধ পথ্য পড়ে না, রোগে ভুগে রাস্তার কুকুর বিড়ালের মত মরতে হয়। জমিদার, জোতদার, মহাজন আর কলওয়ালাদের দল তাদের এই অবস্থা করেছে। বড়লোকের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে আবার সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে হবে। চাষীকে মানুষের মত বাঁচতে হবে। কিন্তু তা করতে হলে তার বড়লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই হবে; না লড়লে মুক্তি মিলবে না। সংগ্রাম করলে যে দাবী আদায় হয় তার প্রমাণ কৃষক সমাজেই আছে। আমাদের দেশে, আর শুধু আমাদের দেশেই বা বলি কেন, পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশেই একদিন এমন অবস্থা ছিল যখন জমিদারের আমলারা যে ভাবে ঠিক করে দিত চাষীদের সেই মত বিনা মজুরীতে খেটে দিতে হত; কোন বিশেষ কারণে কেউ খেটে দিতে না পারলে তার ওপর চলত নির্ম্মম অমানুষিক অত্যাচার। শুধু তাই নয়; জমিদারের হুকুম ছাড়া জমিদারীর বাইরে কেউ যেতে পারত না; তবু নেহাৎ যদি কাউকে যেতেই হত তা হলে এখন যেমন গরুর মালিক গরুর গায়ে লোহা পুড়িয়ে ছাপ এঁকে দেয় গরুটা তার অধিকারে একথা জানাবার জন্যে তখন তেমনি ছাপ দিয়ে দেওয়া হত সেই লোকটির পিঠে যাতে সে অন্য জায়গায় পালিয়ে গেলেও ধরে আনা যায়। জমিদারের অনুমতি ছাড়া অন্যের জমি কিনতে বা তার স্বত্ব লাভ করতে পারা যেত না; এমন কি জমিদারের বিনা আদেশে বিয়ে পর্য্যন্ত করার উপায় ছিল না। এই ধরণের চাষীদের বলা হয় ভূমিদাস।

এদের ওপর জমিদার মর্জি মাফিক ব্যবহার করতে পারত; চাবুক মারা থেকে আরম্ভ করে মেরে ফেললেও বিচার হত না; শাস্তির কথাত ওঠেই না। এর কারণ হল এখন গরু, বাছুর, ভেড়া, ছাগল মানুষের যে ধরণের সম্পত্তি তখন চাষীমানুষ জমিদারের সেই ধরণের সম্পত্তি বলে বিবেচিত হত। চাষীরা লড়াই করে সে সমাজ আজ বদলেছে। সেই পুরাণ সমাজ থেকে আলাদা এক সমাজ হয়েছে কিন্তু চাষীর দুর্দ্দশার শেষ হয়নি; তাই তাকে মাঝ পথে থেমে গেলে চলবে না; লড়াই করতে করতে তাকে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই আসবে মুক্তি।

শ্রেণী সংগ্রাম কি

ভূমিদাস প্রথা থেকে সমাজ যে আজ বর্ত্তমান অবস্থায় এসেছে এর কারণ কি? এই পরিবর্ত্তন কি এমনি এমনি হয়ে গেল না জমিদারের দল ভালমানুষ সেজে তাদের সমস্ত অধিকার স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিল? এর কোনটা নয়। এই পরিবর্ত্তনের জন্যে ভূমিদাসদের লড়াই করতে হয়েছে অনেক, বুকের রক্ত দিতে হয়েছে অনেক, তারপর লড়াইয়ে জিতে জিতে এই অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে। তাই এর চেয়ে ভাল সমাজ ব্যবস্থায় যেতে হলে সেখানে কোন শোষণ থাকবে না, গেয়ে পরে লেখাপড়া শিখে মানুষের মত হতে পারা যাবে—এই রকম গড়তে হলে তাই আরও লড়তে হবে। তারপর যখন জয় হবে শোষিত শ্রেণীর তখন থেকেই গরীব মানুষের স্বর্গ গড়ে উঠতে থাকবে দেশে। এই রকম করেই সমাজ এগুচ্ছে। সমাজের এই অগ্রগতির মূল কারণ—শ্রেণী সংগ্রাম।

শ্রেণী সংগ্রাম কি? প্রত্যেক দেশে বিভিন্ন জাত বর্ণ থাকলেও আসলে কিন্তু দুটো জাত আছে—একটা হল বড়লোকের জাত, এদের বলা হয় শোষক শ্রেণী কারণ এরা পরিশ্রম না করে অন্যের পরিশ্রমের ফল ভোগ করে অন্যটা হল শোষিত শ্রেণী। এদেরই পরিশ্রমের ফল শোষক শ্রেণী ভোগ করে। বড়লোকের দল টাকার জোরে দেশের সমস্ত উৎপাদনের উপায়—কলকারখানা, জমি কিনে নিয়ে তাতে গরীবদের খাটতে বাধ্য করিয়ে মুনাফা লোটে। গরীবদের দলের না খেটে উপায় নেই কারণ বাঁচতে হলে খেতে পরতে হবে আর খেতে পরতে হলে বড়লোকের কাছে খাটতেই হবে কারণ অন্য কোথাও খাটার পথ নাই। বড়লোকেরাও এই সব মেহনতকারী মানুষকে এই রকম পরিমানে খাটুনির মজুরী দেয় যে তাতে মানুষের মত থাকা সম্ভব নয়। যারা প্রকৃত খাটে তাদের এই ভাবে ঠকিয়ে কলওয়ালা ও জমিদারেরা মুনাফা লাভ করে।

আবার এত জাত ধর্ম্ম থাকতে পৃথিবীতে শুধু দুটো জাত—শোষক আর শোষিত আছে এটা বলা কি ঠিক হল? নিশ্চয়ই ঠিক; এর চেয়ে আর ঠিক কথা নেই। উদাহরণ দিলেই পরিষ্কার হবে। হিন্দু জমিদার আর হিন্দু প্রজাত একই ধর্ম্মের; তবুও কেন হিন্দু জমিদার হিন্দু চাষীকে শোষণ করে? মুসলমান মিল মালিক মুসলমান শ্রমিকের ওপর অত্যাচার করতে কসুর করে না। হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার সময় হিন্দু বিড়লারদল সাধারণ হিন্দুকে সাধারণ মুসলমান মারতে প্ররোচিত করেছিল; মুসলমান ইস্পাহানির দল সাধারণ মুসলমানকে হিন্দু মারতে উত্তেজিত করেছিল। এই সব বড়লোকের কথা শুনে সাধারণ হিন্দু মুসলমান, যাদের বেশীর ভাগই হল মজুর ও চাষী, অর্থাৎ শোষিত শ্রেণীভুক্ত, নিজেদের মধ্যে মারামারিতে মেতে উঠল কিন্তু তখন বিড়লার দল আর ইস্পাহানীরদলের এক সঙ্গে এক টেবিলে বসে খানা পিনা করতে বাধেনি বরং কেমন বুদ্ধি করে গরীবদের মধ্যে লড়াই-বাধিয়ে দেওয়া গিয়েছে তাই ভেবে এ ওর গায়ের ওপর ঢলে পড়ে হাসাহাসি করেছিল। শোষিত শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়ার বেলায় বিভিন্ন ধর্ম্মের শোষকরা একহয়, নিজেদের স্বার্থরক্ষার বেলায় তাদের অমিল থাকে না তাই তারা এক জাতের। কিন্তু যেহেতু তারা শোষিত শ্রেণীর তুলনায় সংখ্যায় অনেক কমতাই তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাতে করে শোষিত শ্রেণীর লোকেরা এক হতে না পারে। এই জন্যে তারা ধর্ম্মের দোহাই পাড়ার জন্যে পুরুত বা মৌলভিপাঠায়, ধর্ম্ম আলাদা বলে ঝগড়া বাধাতে চেষ্টা করে, আবার কোথাও এক প্রদেশের লোককে অন্যের বিরুদ্ধে দাঙ্গা লড়তে উস্কানী দেয়।

কিন্তু এত ভুল বোঝান সত্ত্বেও শোষক আর শোষিত—এই দুই শ্রেণীর মধ্যে অবিরাম সংঘর্ষ-বেধে আছে। এই সংঘর্ষেরই নাম হল—শ্রেণী সংগ্রাম। আগেই বলা হয়েছে কলকারখানার মজুর, ক্ষেত খামারের চাষীরা কলকারখানা আর জমিতে খেটে বুকের রক্ত জল করে যে জিনিস উৎপাদন করে কলকারখানার মালিক, জমিদার ও মহাজনের দল না খেটে-তার ওপর ভাগ বসায়। ভাগটা আবার এই হারে বসায় যে মজুর আর চাষীর কপালে কিছুই জোটে না বল্লেই হয়। কলকারখানাগুলি মালিকের অধিকারে থাকায় শ্রমিককে তার অধীনে না খেটে উপায় নেই আবার মজুরও জানে মালিকের হাতে যত কেন পুঁজি থাকুক না যতই শক্তিশালী কলকারখানাগুলি হক না কেন সবই শক্তিহীন হয়ে পড়বে যদি সে না খাটে। তাই শ্রমিক নিজেদের ঐক্যবদ্ধতা বাড়িয়ে তাদের ইউনিয়ন গড়ে মিল মালিকের সঙ্গে সংঘর্ষে নামে। একে বলা হয় পুঁজিপতি শ্রেণীর সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী সংগ্রাম। কৃষির বেলায়ও ঠিক এমনি ভাবে শোষণ চলে। চাষী রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চাষ দেয় আর তার ফল ভোগ করে, জমিদার, জোতদার, ও মহাজনের দল না খেটে। চাষী চায় এই জুলুমের প্রতিরোধ করতে। জমিদার শ্রেণী ও অন্যান্য শোষক শ্রেণীর সঙ্গে কৃষক শ্রেণীর শ্রেণী সংগ্রাম বাধে।

এই ভাবে শোষক শ্রেণীর আর শোষিত শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম লেগেই আছে। শ্রমিক কৃষক শ্রেণীর শত্রুরা বলে থাকে সমাজে শ্রেণী সংগ্রামের কোন অস্তিত্ব নেই, কয়েকজন দেশদ্রোহী লোক এই বিদেশী চিন্তাকে দেশে আমদানী করছে দেশের সর্ব্বনাশের জন্যে। এর চেয়ে বড় মিথ্যে কথা আর নেই কারণ এটা বিদেশ থেকে আমদানী করা মাল নয়, এই দেশের সম্পত্তিগত সম্বন্ধের মধ্যেই এর জন্ম। তাই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে পরিবর্ত্তিত হয়ে শ্রেণীহীন সমাজ না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রেণী সংগ্রাম চলবেই চলবে কারও ইচ্ছা এক রোধ করতে পারবে না।

কি করে ভূমিব্যবস্থা এখনকার অবস্থায় এল

এদেশে ইংরেজের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার আগে চিরকেলে প্রথা অনুযায়ী চাষীই ছিল জমির মালিক। তবে এই মালিকানা ব্যক্তিগতভাবে কোন চাষীর হাতে ছিল না, গ্রাম্য সমাজ, গোষ্ঠি বা গ্রাম সংলগ্ন ভাতৃ সমবায়ের অধীনে ছিল দেশের সমস্ত জমি। দেশের রাজার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল শুধু খাজনার। হিন্দুরাজাদের আমলে এই খাজনার হার ছিল ফসলের ১২ ভাগের ১ ভাগ থেকে ৬ ভাগের ১ ভাগ পর্য্যন্ত আবার কখনও যেমন যুদ্ধের সময় তা আরও বেড়ে গিয়ে ৪ ভাগের ১ ভাগ অর্থাৎ সিকি ফসল পর্য্যন্ত হত। মোগল সাম্রাজ্যের পত্তন হলে এই খাজনা আরও বেড়ে ৩ ভাগের ১ ভাগ দাঁড়ায়। আকবরের কানুনে এ কথা লেখা আছে। তারপর মুসলমান শাসনের শেষাশেষী সময়ে সম্রাট দুর্ব্বল হয়ে পড়লে খাজনা আদায়কারী তহশীলদারই হয়ে ওঠে সামন্ত প্রভু। তখন খাজনা আরও বেড়ে ফসলের অর্দ্ধেকে ওঠে। এই সময় চাষীদের ওপর জোর জবরদস্তি করে ইচ্ছেমত অনেক বেশী খাজনা আদায় করতে এই সব লোভী সামন্ত প্রভুর দল। কিন্তু তবুও তখন জমিতে চাষীরই স্বত্ব ছিল—সারা বছরে উৎপন্ন ফসলের নির্দ্দিষ্ট অংশ রাজস্ব হিসেবে দিলেই খালাস। এতদিন পর্য্যন্ত তা হলে দেখা গেল কৃষি ব্যবস্থা গ্রাম পঞ্চায়েত সামন্ততান্ত্রিক ছিল।

বর্ত্তমানে অনেক কংগ্রেসী নেতা এই গ্রামপঞ্চায়েতী ব্যবস্থাকে সুখী সমাজ বলে প্রচার করছেন, সেখানে নাকি কোন শ্রেণীবিরোধ ছিল না। তাই নাকি সেই আদিম অবস্থা রামরাজত্বেরই রূপ। তাই যদি আসল ব্যাপার হয়, সেখানে যদি সকলেই সুখী হয় তাহলে তা ভেঙ্গে গেল কেন? ভেঙ্গে গেল কারণ এর মধ্যে শোষণ ছিল, বিরুদ্ধ স্বার্থও ছিল। যতই কেন প্রচার করা হক এই গ্রামপঞ্চায়েতগুলি সুখের স্বর্গ ছিল, আসলে কিন্তু সেখানে স্বেচ্ছাচারী সামন্ত রাজের নির্ম্মম অত্যাচার চলত, মানুষকে কূপমণ্ডুক করে রেখে দিত বাইরে যেতে না দিয়ে, জাতিভেদ আর প্রভু ও দাসের শ্রেণীভেদের চাপও পুরোমাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। তখনও শ্রেণী সংগ্রাম চলছিল দুটো বিরোধী শ্রেণীর মধ্যে। এর একাদকে ছিল সেই সমাজের শাসক শ্রেণী—সমস্ত প্রভুরা অন্যদিকে ছিল অত্যাচারিত শ্রেণী, যার মধ্যে ছিল সাধারণ

ক্ষেত মজুরদের প্রতি

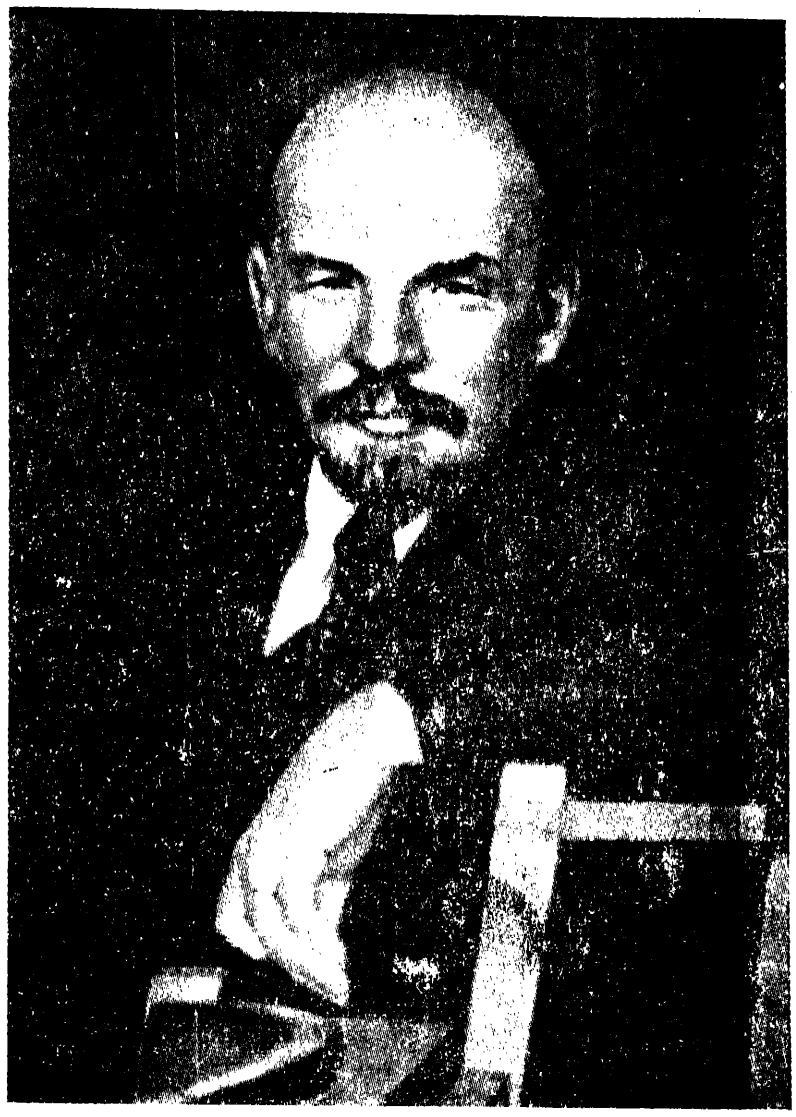

"আমরা দেখেছি যে ধনী কৃষক শ্রেণী কেবল মাত্র নীচের শ্রেণীকেই নয়, মাঝারী কৃষককেও চাপ দিয়ে ঠেলে বের করে দেয়।.....চাষীর প্রকৃত মুক্তি কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রেই সম্ভব।"—লেনিন।

প্রজারা আর একদল ব্যবসায়ী যারা ইংরেজের সঙ্গে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করে মুনাফা লুটতে চাইছিল কিন্তু নবাবী ব্যবস্থায় বাধা পাচ্ছিল। একে সামন্ত প্রভুরা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে দুর্বল, তার পর তখনকার সমাজের বিরুদ্ধ শক্তি ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠছিল—এমনি সময়ে ইংরেজ বাংলার মাটীতে পা দিল। সমাজের অগ্রগতির দিক থেকে ইংল্যাণ্ড তখন ভারতবর্ষের চেয়ে এগিয়ে গিয়েছে, সামন্ততন্ত্র ধ্বংস করে সেখানে তারা পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে। এসেই সে বুঝল দেশের আসল অবস্থা, তাই সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে একত্রিত করে পলাশীর যুদ্ধে নবাবকে পরাজিত করল। ইংরেজ ব্যবসায়ীর দল অস্ত্র শস্ত্রের সঙ্গে আনল আমদানী রপ্তানী প্রথা। এর আঘাতে জীর্ণ গ্রাম পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা চুরমার হয়ে গেল আর তার জায়গায় জন্ম নিল এক নতুন ব্যবস্থা।

ইংরেজের হাতে শাসনভার চলে যাবার আগে যে জবরদস্তিমূলক খাজনা আদায় করা হত তাকে বিজয়ী ইংরেজ স্বাভাবিক ধরে নিয়ে নিজেদের কর নির্দ্ধারণ নীতি ঠিক করে। ফলে ফসলের ৫ ভাগের ৪ ভাগ পর্য্যন্ত খাজনা দিতে হয়। এই ভাবে চড়া হারে খাজনা আদায়ের জন্য জমিগুলিকে প্রতি বছর নীলামে চড়ান হত; যে বেশী দরে নিতে পারত তারই অধিকারে যেত জমি। বাংলার আগেকার সামন্ত প্রভুরা, বড় বড় জমিদার গোষ্ঠি, ইংরেজের সঙ্গে ব্যবসায়ে লিপ্ত দেশী ব্যবসায়ীরা চড়া হারে এই জমিদারীগুলির পত্তনি নিয়ে প্রজাদের চূড়ান্ত শোষণ করত। এই ভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার বদলে ব্যক্তিগত জমিদারীর পত্তন হল। আর এই জমিদারদের অবাধ শোষণের ফল হিসেবেই আসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, লাখ লাখ বাঙ্গালী প্রাণ দিয়ে ইংরেজের শোষণের পথ করে দেয়।

এইভাবে চূড়ান্ত লুণ্ঠনের ফলে বাংলার কৃষি ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়াল; সঙ্গে সঙ্গে রাজস্বের পরিমানও কমে যেতে লাগল। ব্যবসায়ী ইংরেজ এতদিন ভারতবর্ষে রাজত্ব প্রতিষ্ঠার কথা ভাবে নি তাই শুধু লুণ্ঠনই করে গিয়েছে। রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দেখল এই ভাবে অবাধ লুণ্ঠন করলে চলবে না, আর কৃষকদের কাছে অনেক খাজনা আদায় করারও হাঙ্গামা অনেক তাই ইংরেজ রাজা জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করল। জমিদারেরা জমির মালিক বলে স্বীকৃত হল, সরকার তাদের কাছ থেকে নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব নেবে —এই হল চুক্তি।

যত দিন যাচ্ছে চাষী তত শোষিত হচ্ছে

এদেশে খাজনা দেওয়ার পদ্ধতি আগে এখনকার মত ছিল না। সারা বছরের ফসল হিসেব করে যেবারে যেমন ফসল হল বা হল না—সমস্ত বিষয় বিচার করে গ্রাম পঞ্চায়েত শাসনকর্ত্তাকে তার পাওনা অংশ ফসলের হিসেবে মিটিতে দিত। এখন তা বদলে গিয়ে দাঁড়াল —প্রত্যেকটি লোক তা সে খাঁটি চাষীই হক আর সরকারের নিযুক্ত জমিদারই হক—প্রত্যেককে তার নিজস্ব জমির পরিমান অনুযায়ী ফসলের বদলে টাকায় খাজনা দিতে হবে। ফসল হক বা না হক একথা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনা হবে না। এই খাজনাও দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে আর চাষী দিনের পর দিন বেশী করে শোষিত হচ্ছে। কি ভাবে খাজনা বাড়ছে তা হিসেবে দেখলেই বোঝা যাবে। মুসলমান রাজত্বের শেষ বছর ১৭৬৪-৬৫ সালে বাংলা দেশের রাজস্বের পরিমান হয়েছিল ৮ লক্ষ ১৮ হাজার পাউণ্ড, ইংরেজ ব্যবসায়ী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের প্রথম বছরে তা বেড়ে হয় ১৪ লক্ষ ৭০ হাজার পাউণ্ড, ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ৩০ লক্ষ ৯১ হাজার পাউণ্ড। ১৮০১ সালে ৪২ লক্ষ পাউণ্ড, ১৮৫৭-৫৮ সালে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ, ১৯০০ সালে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ, ১৯১১ সালে ২ কোটি এবং ১৯৩৬-৩৭ সালে ২ কোটি ৩৯ লক্ষ পাউণ্ড। এক পাউণ্ডের দাম ১৩ টাকার মত। তা হলে পরিস্কার হল প্রতিদিন শোষণ কি রকম বেড়ে চলেছে।

এই শোষণ ছাড়াও আর একটা পরিবর্ত্তন আনল ইংরেজ। আগে রাজার প্রাপ্য অংশের ভাগ বসাতে মধ্যস্বত্বের কেউ ছিল না। এখন তা হল। জমিদারের দল সরকারের হয়ে রাজস্ব আদায় করবে আর বিনিময়ে নেবে রাজস্বের একটা মোটা অংশ। কি রকম মোটা ধারণাতেই আসে না। বাংলা দেশের মোট খাজনা ১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ডের মধ্যে সরকার পেত ৩০ লক্ষ পাউণ্ড বাকী ৯০ লক্ষ পাউণ্ড জমিদারের পকেটে যেত। এই ভাবে একটা শ্রেণী ইংরেজ সৃষ্টি করেছিল তাকে সমস্ত রকম অত্যাচার আর শোষণের কাজে ভাল করে পাবে বলে।

লাখে লাখে চাষী ক্ষেতমজুরে পরিণত হচ্ছে আর জনা কয়েকের হাতে জমি জমছে

ভারতে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে ভারতীয় কৃষি ধনিক প্রথার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্বের মধ্যে এসে গেল। এই ধনিক প্রথা প্রবেশ করছে মহাজনী ঋণকে আশ্রয় করেই। মহাজনের দেনার দায়ে চাষী একের পর জমি হতে উচ্ছেদ হয়েছে আর সেই জমি গিয়ে জমেছে মহাজনদের হাতে। এরা নিজেরা চাষ বাস করে না বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে, চাষের যন্ত্রপাতি কিনে ক্ষেত মজুরের সাহায্যে ধনতান্ত্রিক প্রথায় চাষ বাস করায়। ধনতান্ত্রিক প্রথায় চাষের লক্ষণ হল ক্ষেতমজুরে সংখ্যা বৃদ্ধ আর এই ক্ষেতমজুরের সংখ্যা কি ভাবে বেড়ে চলেছে তা নীচের তালিকা দেখলেই বুঝতে পারা যাবে। ১৮৮২ সালে ক্ষেত মজুরের সংখ্যা ছিল ৭৫ লক্ষ, ১৯২১ সালে ২ কোটি ১৫ লক্ষ, ১৯৩১ সালে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ, ১৯৩৩ সালে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ, এবং ১৯৪৪ সালে ৬ কোটি ৮০ লক্ষ। এর পর আরও বেড়েছে। এই যে ক্ষেত মজুরের সংখ্যা বাড়ছে এরা কোথা থেকে আসছে? গরীব চাষী যাদের দুচার বিঘা জমি ছিল তারাই ক্রমে ক্রমে তাদের জমি থেকে উৎখাত হয়ে মজুরে পরিণত হচ্ছে। ধনতন্ত্রের আক্রমণের কায়দাই হল এই। একদিকে টাকার জোরে সমস্ত উৎপাদনের যন্ত্র, কলকারখানা, জমি কিছু লোকের হাতে গিয়ে জমে অন্যদিকে দেশের বেশীর ভাগ লোক একেবারে নিঃস্বে পরিণত হয়ে নিজের শ্রম বিক্রি করে জীবন ধারণ করতে বাধ্য হয়। আমাদের এই বাংলা দেশে—দেশ ভাগ হয়ে যাবার আগে—কৃষি কাজে যত লোক খাটত তার ১০০ জনের মধ্যে সাড়ে ৩৬ জনের কোন জমি ছিল না, সাড়ে ১৭ জনের জমি ৩ বিঘার ও কম। তাহলে দেখা গেল মোট কৃষক পরিবারের শতকরা ৫৪ জনের কোন জমি নেই বল্লেই হয়। একেবারে নেই বল্লে যদি কোন বড়লোকের আপত্তি হয় তাহলে ঠিক করে বল্লে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই রকম—শতকরা ৫৪ জন কৃষক পরিবারের হাতে সমস্ত জমির শতকরা ৬ ভাগ। এই গেল এক

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

মজুরের মুক্তির লড়াইএর পাশে নিজেদের লড়াই

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)

দিক ; উল্টা দিকে শতকরা ১৪ জনের অধিকারে মোট জমির শতকরা ৬৩ ভাগ। তাহলে দাঁড়াল কি? একদিকে কোটি কোটি চাষীর হাতে কোন জমি নেই অন্য দিকে কয়েকজন টাকাপয়সাওয়ালা লোক সমস্ত জমির অধিকারী। যারা সত্যি চাষী তারা জমির অভাবে মরছে আর যারা চাষীই নয় তারা টাকার জোরে সব জমি কিনে নিচ্ছে।

মাঝারী চাষীরও নিষ্কৃতি নেই

এই অবস্থার প্রতিকারে গরীব চাষী আর ক্ষেত মজুরের দল বহুবার লড়াই করেছে। মাঝারী চাষীরা কোথাও কোথাও সাহায্য করলেও তারা জমিদার ও পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বেশীর-ভাগ জায়গায় দোনামনা হয়ে রয়েছে। এর মতন ভুল আর নেই। মাঝারী চাষীরা যদি ভেবে থাকে ধনতান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থায় তাদের দুঃখ দূর হবে তাহলে শেষে পস্তাতে হবে। মাঝারী চাষীরা কি রকম করে ক্ষেত মজুরে পরিণত হচ্ছে দেখা যাক। মাঝারী কৃষক কাকে ধরব? ১০।১৫ বিঘা জমি যার আছে, নিজে চাষ করে—এই রকম চাষীই মাঝারী কৃষক। যে সমস্ত হিসেব পত্র পাওয়া গিয়েছে তা থেকে জানা যায় ১৯৪০ সালে ১৫ বিঘা জমি আছে এমন কৃষক পরিবারের সংখ্যা হল মোট কৃষক পরিবারের শতকরা ২৫ ভাগ। পাঁচ বছর পরে ১৯৪৫ সালে তা কমে দাঁড়ায় শতকরা ১৪ ভাগে। এই পাঁচ বছরের মধ্যেই শতকরা ১১ ভাগ কমে গিয়েছে। এই সব মাঝারী চাষীকে তখন হয় ক্ষেত মজুরে পরিণত হতে হয়েছে নয় জমিদারের জোতদারের অধীনে ভাগ-চাষ করতে হয়েছে। সুতরাং মাঝারী চাষীও যে বড়লোকদের পুঁজির আক্রমণে জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পথে এসে দাঁড়াচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। তাই বাঁচতে হলে তাকেও জমিদারী ও পুঁজিবাদী আক্রমণকে রুখতে হবে।

ক্ষেত মজুরের মজুরী ক্রমেই কমছে

প্রায়ই প্রচার করা হয়ে থাকে বর্ত্তমান চড়া দামের সময়ে লাভ যদি কারও হয়ে থাকে তাহলে তা মজুর আর চাষীদের হয়েছে। দেখা যাক বাবুদের একথা কত দূর সত্যি।। কৃষির ওপর নির্ভরশীল পরিবারের অর্দ্ধেকের বেশী হল ক্ষেত মজুর। তাদের আয় যে কমছে তা ইংরেজ সরকারও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। শুধু মজুরী বেড়েছে এ কথা বললে চলবে কেন? সঙ্গে সঙ্গে জিনিষপত্তরের দামও যে বেড়ে গিয়েছে। যদি জিনিষপত্তরের দাম বৃদ্ধির চেয়ে মজুরী বেশী বেড়েছে প্রমাণ করা যায় তাহলে স্বীকার করতে হবে—সত্যিই মজুরী বেড়েছে। আর তা না হয়ে যদি ব্যাপারটা উল্টো হয়, জিনিষপত্রের দাম যত বেড়েছে মজুরী তত বাড়েনি—তাহলে কি হল? তাহলে আসল মজুরী গেল কমেই। ক্ষেত মজুরদের ব্যাপারও ঠিক তাই। ১৮৪৩ সালে সালে মজুরী ১ আনা ধরলে ১০০ বছর বাদে ১৯৪৩ সালে মজুরী ১৬ গুণ বেড়ে হয়েছে ১ টাকা। শুধু এইটুকু বলে মজুরী বেড়েছে বল্লে চলবে কেন? সঙ্গে সঙ্গে বলতে হবে বাঁচার খরচ কত গুণ বেড়েছে। চালের কথাই ধরা যাক। ১ আনা মজুরীর সময় ১ মন চালের দাম ১ টাকা হলে ১৯৪৩ সালে তা হয়েছে ৩৫ টাকা। সুতরাং পরিষ্কার হল মজুরী ১৬ গুণ বাড়লেও খরচ বেড়েছে ৩৫ গুণ অর্থাৎ আসল মজুরী কমে গিয়েছে আড়াই গুণ। ১৯৪৩ সালের পর অবস্থা আরও খারাপের দিকে।

কংগ্রেসী রাজত্বের প্রতিকার হবে না।

আর একটা কথা চাষীদের বোঝাবার চেষ্টা করা হচ্ছে—এতদিন দেশ পরাধীন ছিল তাই চাষী মজুরদের দুঃখ ছিল; এখন দেশের লোক দেশ শাসন করছে—সুখ সুবিধা নিশ্চয়ই হবে। ভারত-বাসীরা দেশ শাসন করত না শুধু এই কারণেই দেশের লোক স্বাধীনতার জন্য লড়েনি। তারা দেখেছিল ইংরেজ শাসনে দেশের শিল্প বৃদ্ধি হচ্ছে না, কৃষির উন্নতি হচ্ছে না বরং অবনতি হচ্ছে দেশের লোকের দুর্দ্দশা বেড়ে চলেছে তাই তারা লড়েছিল। স্বাধীনতা বলতে তারা বুঝেছিল বাস্তব জিনিষ। তা না হয়ে যদি ইংরেজের বদলে একদল ভারত-বাসী শাসন চালায় আর আগের মতন শোষণ চলে তাহলে তাকে দেশের লোক মেনে নিতে পারে না। যদি দেশ বলতে দেশের লোক বোঝায় তাহলে প্রত্যেক দেশেই এমন কিছু লোক থাকে যারা দেশদ্রোহী। এই দেশদ্রোহী শাসকের স্বাধীনতাকে স্বাধীনতা বলা যায় না। তাই শুধু দেশের লোকে শাসন চালাচ্ছে দেখলে হবে না; দেখতে হবে কোন শ্রেণীর দল শাসন করছে—শোষক না শোষিত শ্রেণীর দল। মিলমালিক, জমিদার, জোতদারের দল শাসন করলে তারা চেষ্টা করবে ঐ সব শোষক শ্রেণীর সুবিধা করে দিতে। আর শোষক শ্রেণীর সুবিধা করে দেবার মানে শোষিত শ্রেণীর—মজুর, চাষীদের দুঃখ দুর্দ্দশা বাড়া। যতদিন যাবে শোষক শ্রেণী ক্ষমতা ভোগ করে তত জোরদার হয়ে উঠবে ফলে শোষিত শ্রেণীর ওপর অত্যাচার তত বাড়বে। তাই যদি দেখা যায় ভারতবর্ষে শাসন চালাচ্ছে বড় লোকের দল তাহলে তাকে সময় দিলেও সে গরীবের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করবে না বরং আরও কায়দা করে বেশী ভাবে তাদের শোষণ করবে। সে ক্ষেত্রে সময় দেওয়া আত্মহত্যারই সামিল।

কংগ্রেসী নেতারা ক্ষমতা পাবার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত যা যা কাজ করেছে তাতে কোথাও গরীবদের ভাল হবার মত কিছু নেই। সত্যিই যদি চাষীদের ভাল তারা চাইত তাহলে তারা ক্ষমতা পেয়েই জমিদারী জোতদারী প্রথা ভেঙ্গে দিয়ে খোদ চাষীর মধ্যে জমি বিলি করে দিত; খাজনার হার কমিয়ে দিত। বিনা সুদে কৃষিঋণ দেবার ব্যবস্থা করত, আর বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষির উন্নতি করার জন্যে চেষ্টা করত। এসব কথা তারা ক্ষমতা দখল করার আগে করবে বলে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোথাও কি করেছে? এর বদলে চাষীরা যেখানে জমিদারের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়েছে—কি তে-ভাগার জন্যে, কি খাজনা কমাবার দাবীতে, কি জমির জন্যে—সেইখানে প্রত্যেক জায়গাতেই কংগ্রেসী সরকারের পুলিশ জমিদারকে সাহায্য করেছে আর গরীব চাষীদের ওপর গুলি চালিয়েছে, ঘরদোর জ্বালিয়ে দিয়েছে, মেয়েদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করেছে, এমন কি গর্ভবতী চাষী মেয়েদের ওপর অত্যাচার করে তাদের গর্ভপাত পর্য্যন্ত করেছে। কোন সরকার চাষীর ভাল চাইলে এই রকম করতে পারে না। তার ওপর কমদামে ধান এক রকম কেড়ে নিচ্ছে আর সেই ধান সরকার চাল তৈরী করে বেশী দামে বিক্রী করছে, তামাক সুপারী প্রভৃতি জিনিষের ওপর রাজ ট্যাক্স বাড়াচ্ছে, নতুন করে কৃষির ওপর ট্যাক্স বসাতে চলেছে—এই ভাবে গরীব-দের পেটে মারার ব্যবস্থা হচ্ছে। বড় লোকদের বেলায় কিন্তু তোয়াজের অন্ত নেই। লাভের ওপর যে কর দিতে হত কংগ্রেসী সরকার তা মকুব করে দিয়েছে। চোরাকারবার চালালেও সাজা হয় না। গাড়ী গাড়ী চাল জোতদারের দল নিয়ে যাচ্ছে কংগ্রেসী সরকারের লোকের চোখের ওপর দিয়ে চোরাকারবারের জন্যে তাদের কিছু হয় না আর গরীব চাষী খাবার জন্যে ১ সের চাল এক গ্রাম থেকে পাশের গ্রামে নিয়ে যেতে চাইলে তাকে লাঠি মেরে, গুলি মেরে জব্দ করা হয়। এ সব ব্যাপার ত হামেসাই ঘটছে। সত্যিকারের কোন কৃষক মজুররাজ এ সব কি করতে পারে? কংগ্রেসী নেতারা তিন বছর ক্ষমতা পেয়ে চাষীর জন্য কিছু করে উঠতে পারল না আর রাশিয়া বলে একটা দেশ আছে যেখানে মজুর-চাষীর দল লড়াই করে বড়লোক-দের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এক আদেশে সমস্ত জমি-দারীর ধ্বংস করে চাষীর হাতে জমি তুলে দিয়েছিল। কেন করল? কারণ তারা যে প্রকৃত শ্রমিক কৃষকের দল। শুধু স্বাধীনতা বলে চেঁচালে হবে কেন? স্বাধীনতা কথাটা শুনতে মন্দ নয় কিন্তু তার কোন দাম নেই গরীবদের কাছে যতদিন না তাদের ভালভাবে খেয়ে পরে মানুষের মত বাঁচার সুবিধা তাতে আসছে। তারপর বুঝে নিতে হবে এবং সুযোগ পেলে নেতাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে—দেশের লোকের মধ্যে যখন বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে, বড়লোক, গরীবলোক রয়েছে তখন এ স্বাধীনতা কার স্বাধীনতা? বড়-লোকের স্বাধীনতার মানে হল গরীবকে বেশী করে শোষণ করার স্বাধীনতা আর গরীবের স্বাধীনতার মানে হল সেই শোষণকে দূর করে শ্রমিক কৃষকের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা। এক শ্রেণীর স্বাধীনতা অন্য শ্রেণীর স্বাধীনতার ঠিক বিপরীত। সুতরাং ভারতবর্ষের স্বাধীনতটা কোন শ্রেণীর?

বাংলাদেশে জমিদারী প্রথা বিলো-পের জন্য নাকি আইন করা হবে। একথা অবশ্য আমরা তিন বছর থেকে শুনে আসছি; তবুও তা এখনও হয় নি। আর তা হলেও চাষীর ঘাড়ে আরও বোঝা চাপবে। কেমন করে? প্রথমে জমিদারের খাস জমিতে হাত দেওয়া হবে না তা জমিদারেরই থাকবে। বাকী থাকে প্রজা বিলি জমি। সে গুলির জন্য

সমাজতন্ত্র কায়েম করলে

গড়ে তুলে জোর করে শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে

তবেই হবে চাষীর মুক্তি

খেসারত দেওয়া হবে কোটি কোটি টাকা। আগেই দেখা গিয়েছে জমিদারের দল ইংরেজের পায়ে দেশকে বিকিয়ে দেবার পুরস্কার হিসেবে যে জমি পেয়েছিল তা থেকে তারা বছরে বিনা পরিশ্রমে ১১ কোটি টাকা লুটেছে। তবুও আবার তাদের কোটি কোটি টাকা খেসারত দেওয়া হবে। আর এ টাকা দিতে হবে কাকে? যে গরীব চাষী মুখে রক্ত তুলে দুবেলা দুমুঠো খেতে পায়না তাকেই। জমিদারের খেসারত জোগাবার জন্যে নতুন নতুন কর চাষীদের ওপর চাপবে তা চাষীদের দিতেই হবে, না দিলে গুলি চলবে। এ টাকা নিয়ে জমিদারের দল ধনতান্ত্রিক কায়দায় চাষবাস, করাবে ক্ষেত মজুর দিয়ে। চাষীকে এখন যেমন উঁচু হারে খাজনা দিতে হয় তা কমবে না, পোষ্যবর্গের অনুপাতে চাষী জমি পাবেও না বরং কোন অঞ্চলের জমির ৭৫ ভাগের মালিক যদি বলে বাকী ২৫ ভাগ দখল করে নেওয়া উচিত তা করা হবে। জমির ৭৫ ভাগের মালিক হল জমিদার জোতদারের দল; তারা বললেই মাঝারী ও গরীব চাষীর জমি কেড়ে নেওয়া হবে। সুতরাং আরও চাষী ক্ষেত মজুরে পরিণত হবে। এইটাই চায় কংগ্রেসী সরকার। কারণ ক্ষেত মজুর দিয়ে ধনতান্ত্রিক কায়দায় কৃষি ব্যবস্থার পত্তনই হল ভারতীয় পুঁজিপতিদের লক্ষ্য। তাদের দল কংগ্রেস তাই সেই চেষ্টা করছে। এই সব কারণে কংগ্রেসী নেতারা জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে মাঝে মধ্যে দু'চারটে কথা বললেও জোতদারীর বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করে নি। এই জোতদার শ্রেণী হচ্ছে ধনী চাষী, গ্রামের ধনিকশ্রেণী; এরাই হল গ্রামে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ঘাঁটি।

এ অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে হলে কি কি চাই

চাষীর এই দুর্ভোগের হাত হতে বাঁচতে হলে কি কি দাবী করতে হবে। (১) জমিদারী জোতদারীর বিনা খেসারতে বিলোপ ও খোদ চাষীর হাতে জমি বিলি। (২) খাজনা কমাতে হবে। (৩) অলাভজনক জমির ওপর খাজনা মকুব করতে হবে,, (৪) সমস্ত চাষীর যত ঋণ আছে তা মকুব করে দিতে হবে, (৫) বিনা সুদে নতুন কৃষিঋণের ব্যবস্থা করতে হবে, (৬) উন্নত ধরণের চাষ বাসের সুবিধা দিতে হবে, (৭) আইন করে জমি কেনা বেচা বন্ধ করতে হবে। ক্ষেত মজুরদের বেলায় এ দাবী ছাড়াও আরও দাবী তুলতে হবে। ১। জিনিষ পত্রের দাম অনুযায়ী মজুরী দিতে হবে, ২। সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টার বেশী ঘাটান চলবে না; কেউ যদি ইচ্ছা করে খাটে তার জন্যে উপরী মজুরী দিতে হবে। ৩। ছুটী প্রভৃতি যে সমস্ত সুবিধা ফ্যাক্টরীর মজুর পায় তা দিতে হবে।

দাবীগুলি বিচার করে দেখা যাক। খাঁটি চাষী আজ জমির অভাবে মরছে আর অচাষী মালিক ও প্রজার সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এ অবস্থা চলতে পারে না। না খেটে অন্যের পরিশ্রমের ফল ভোগ করবে, এই মতলব ব্যর্থ করতেই হবে। তাই শুধু বিনা খেসারতে জমিদারী জোতদারীর বিলোপ করলেই চলবে না, খোদ চাষীর হাতে জমিও দিতে হবে পোষ্যবর্গের অনুপাতে। বাংলাদেশের খাজনার হার অত্যন্ত বেশী; এ কমাতেই হবে। তারপর যে জমিতে লাভ হয় না সে জমির ওপর খাজনা থাকতেই পারে না। মহাজনী ঋণের ভারে বাংলার চাষীরা আজ ধ্বংসের শেষ সীমায় উপনীত। এই ঋণের জালে একবার জড়ালে তা থেকে নিস্কৃতি নেই। মূলধনের ১০।২০ গুণ টাকা দিয়েও শোধ হয় না—তার পর ঋণশালিসী বোর্ড চালু হবার পর চাষীকে বাধ্য রাখার জন্যে মূলধনের ৫।৭ গুণ হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং বেশীর ভাগ জায়গায় আবার জমি সাফ কবলা করে দিলে তবেই টাকা দেওয়া হয়েছে। চাষীর মোট ঋণ মকুব করতেই হবে এই শয়তানী চক্র থেকে রক্ষা পেতে হলে। উন্নতভাবে চাষবাস করতে হলে, সার, বীজ, জলসেচ প্রভৃতির ব্যবস্থা এবং চাষের যন্ত্রপাতির জন্য বিনা সুদে কৃষি ঋণ মঞ্জুর করতে হবে। জমি যথেচ্ছা ভাবে কেনা বেচা বন্ধ করতে হবে। চাষী জমি চাষ করতে পাবে, তার ফসলও পাবে পুরোপুরি কিন্তু বিক্রি করতে পাবে না। গরীব ও মধ্যচাষীদের এতে ভয় পাবার কিছু নেই যদিও ধনী চাষীরা তাদের ক্ষতি হবে এই কথা বোঝাবার চেষ্টা করে আসছে। আগের ঘটনা থেকে জানা গিয়েছে যে—গরীব আর মধ্যচাষীর হাত থেকে শুধু টাকার জোরে জমিদার আর ধনী চাষী জমি কিনে নিচ্ছে। একে রোধ করতে হলে টাকার জোর ভেঙ্গে দিতে হবে আর তা করার একমাত্র উপায়—জমি কেনা বেচা বন্ধ করে দেওয়া। মধ্যচাষী ভাবতে পারে জমির মালিকানা তার হাত থেকে চলে গেল। কথাটা ঠিক তা নয়। জমি যদি চষতে পাই যদি তার উপসত্ব ভোগ করতে কোন বাধা না থাকে, চাষের কাজে সাহায্যের জন্য বিনা সুদে ঋণ মেলে তাহলে তার দুঃখ থাকবে না সুতরাং জমি বেচার প্রয়োজনও পড়বে না। আর যদি এই ধরণের কোন আইন না থাকে তাহলে বরং ধনী চাষীর দলের আক্রমণে সে টিকতেই পারবে না। ক্ষেত মজুরদের দাবীর কথা আরও পরিষ্কার। একদিকে জিনিষপত্রের দাম বেড়ে যাবে অন্যদিকে তাদের মজুরী সেই অনুপাতে বাড়বে না এ অবস্থা মানা চলতে পারে না। তাই জীবনযাত্রার খরচের অনুযায়ী মজুরী দিতে হবে। তারপর সেই যে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পরিশ্রম এও চলবে না। আর ক্ষেত মজুরও যখন মজুর তখন কলকারখানার মজুরদের মত এদেরও সুখ সুবিধা দিতে হবে।

লড়াইএর হাতিয়ার চাই

চাষীদের ভূমিদাস অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে লড়াই করতে হয়েছিল। লড়াই ছাড়া ভিক্ষেয় কিছু মেলে না। চাষী ভাইদেরও তাই বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। চাষীর সবচেয়ে বড় শত্রু জমিদার জোতদারের দলকিন্তু আজ একা নয়, তার পেছনে পুঁজিবাদী ভারতীয় রাষ্ট্র। দেশের শাসন কলওয়ালাশ্রেণীর হাতে; তারা জমিদার জোতদারের বন্ধু—এক শোষক শ্রেণীর বলে। তারা জমিদারের বিরুদ্ধে চাষীর লড়াইয়ে তাই জমিদারের পক্ষ নেয়। এই পুঁজিপতি শ্রেণী রক্ষা না করলে চাষীরা জমিদারের দলকে এক মুহূর্ত্তে উড়িয়ে দিতে পারে। তাই আজ জমিদারী জোতদারী প্রথাকে হঠাতে হলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে আগে হঠাতে হবে। পুঁজিবাদ এখনও শক্তিশালী; সুতরাং তার বিরুদ্ধে লড়তে হলে চাষীর বন্ধুর দরকার। কলকারখানার মজুর হল সেই বন্ধু। পুঁজিপতিদের জারিজুরি এত, কলকারখানাগুলি তাদের হাতে আছে বলে। সেই কলকারখানাগুলি অচল করে দিতে পারে বলে আর শ্রমিকশ্রেণী সব চেয়ে বিপ্লবী বলে পুঁজিপতির দল এদের সব চেয়ে ভয় করে বেশী। এই শ্রমিকশ্রেণী লড়ছে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে। তাদের সংগ্রামের সঙ্গে চাষীর লড়াইকে মিশিয়ে দিতে হবে। এই দুজনের মিলিত শক্তিতে শোষকের দলকে ধ্বংস করে শোষিতের রাষ্ট্র গড়া যাবে।

কিন্তু লড়াই চালাতে হলে অস্ত্র দরকার। এই অস্ত্র হল সংগঠন। সমস্ত মধ্য ও গরীব চাষী যদি মিলিত হয়ে যুক্ত কিষাণ সভা গড়ে আর সমস্ত ক্ষেত মজুর যদি ক্ষেতমজুর সমিতি গড়ে কলকারখানার শ্রমিকের সঙ্গে লড়ে তাহলে তাকে ঠেকাবে কে? এই সংগঠনকে আজ জোতদার করে তুলতে হবে। যদি তা পারি তাহলে সে সংগ্রামে জয়লাভ আমাদের হবেই হবে। শোষণ দূর হয়ে গিয়ে গরীবের স্বর্গ রাজ্য তখনই প্রতিষ্ঠা হবে আমাদের দেশে।

সিটি কেবিনেট

আধুনিক ফ্যাসানের আসবাব প্রস্তুতকারক

৫৭।২ই, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

নারীর প্রকৃত মুক্তি একমাত্র শ্রমিক কৃষক

প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক যুগে যখনই শোষিত মানুষ এগিয়ে এসেছে শোষণ আর অত্যাচারের মূলোৎপাটন করতে তখনই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের সমর্থকরা তাকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে তার বিরুদ্ধে জঘন্য ষড়যন্ত্র করেছে, তাকে জনসমর্থন থেকে বঞ্চিত করার জন্য তার নামে মিথ্যা কুৎসা রটিয়েছে, সংগ্রামকে স্তব্ধ করার জন্য সমস্ত প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে একত্রিত করে বাধা দিয়েছে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল—নিজেদের কায়েমী শ্রেণী স্বার্থরক্ষা। কিন্তু তবুও প্রগতিবাদী জনতা সেই মিথ্যা প্রচারকে ব্যর্থ করে নতুন সমাজ, নতুন জীবন গড়ে তুলেছে। এই কারণে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী সামন্ততান্ত্রিক সমাজের পাহারাদারদের কাছ থেকে প্রচণ্ড বিরুদ্ধতা যেমন একদিকে পেয়েছিল তেমনি অন্যদিকে আবার বৃহত্তর শক্তিশালী গণশক্তি হাজার বাধা বিপত্তির মধ্যেও তাকে প্রতিষ্ঠার জন্য যথাসর্ব্বস্ব দিয়েছে। তারপর এই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব ধনিক শ্রেণীর হাতে থাকায় বিপ্লব লক্ষ্যে না পৌঁছে অর্দ্ধ পথেই যখন পরিসমাপ্তি লাভ করল, সাম্য, মৈত্রী আর স্বাধীনতা শুধু কাগজেপত্রেই সীমাবদ্ধ রইল গণজীবনে তার বাস্তব প্রয়োগ হল না। বরং তার বদলে এক নতুন শ্রেণীশোষণ প্রতিষ্ঠিত হল তখন শোষিত শ্রেণী সেই অর্দ্ধপথে স্থগিত বিপ্লবকে তার স্বাভাবিক লক্ষ্যে নিয়ে গিয়ে প্রকৃত সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নামল যেই, তখনই সে হয়ে পড়ল সমাজবিরোধী জাতীয় শত্রু, ধনিক শ্রেণীর চোখে। ফলে তার বিরুদ্ধে অপপ্রচারে মেতে উঠল এক কালের বিপ্লবী কিন্তু তখনকার দিনের কায়েমী স্বার্থের সমর্থক ধনিক শ্রেণী। এমনি করেই সমাজের কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণী বার বার বাধা দিয়েছে সেই সমাজের পরিবর্ত্তনকে, সাধারণভাবে সমাজের অগ্রগতিকে।

ভারতবর্ষেও তা হয়েছে এবং হচ্ছে। যে নেতারা ক্ষমতা দখলের আগে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীকে দলে দলে যোগ দেবার আহ্বান জানিয়েছিলেন, ঘোষণা করেছিলেন ভারতবর্ষের প্রতিটি লোকের—তা সে ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, স্ত্রী, পুরুষ যাই হোক না কেন—নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার স্বাধীনতা আছে এবং তাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংগ্রাম করার অধিকারও আছে সেই নেতারা রাষ্ট্রযন্ত্র করায়ত্ত করেই নতুন সুরে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। নারীর জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হল "গৃহাভ্যন্তরে"। হিটলার জার্ম্মাণীর নারীসমাজের ওপর হুকুমনামা জারী করেছিলেন যে, নারীকে গৃহাভ্যন্তরে থাকতে হবে। আমাদের দেশের নেতারাও সেই সুরেই কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। ফ্যাসিষ্ট হিটলারের সঙ্গে তথাকথিত গণতন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু ও গান্ধীজীর শ্রেষ্ঠ শিষ্য রাজা গোপালের কোন পার্থক্য নেই এ বিষয়ে। না থাকারই কথা অবশ্য স্বাভাবিক; কারণ বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে এমন কোন নীতিগত মূল পার্থক্য বা স্পষ্ট ভাগ নেই; মূলে একে অপরের সঙ্গে জড়িত। যুদ্ধ এবং সর্বহারা বিপ্লবের যুগে ধনিক শাসন বজায় রাখার এক উপায় ও বিপ্লবী প্রগতির বিরুদ্ধে ধনিক শ্রেণীর প্রতিবিপ্লব হল ফ্যাসিবাদ। সেই হিসাবে ফ্যাসিবাদ নিশ্চয়ই প্রতিক্রিয়া। কিন্তু প্রত্যেক প্রতিক্রিয়াই ফ্যাসিবাদ নয়। ইহা প্রতিক্রিয়ার এক নির্দ্দিষ্ট রূপ যার দার্শনিক ভিত্তি হল বিজ্ঞানবিরোধী আধ্যাত্মবাদ, অথচ ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বস্তা পচা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ ও revivalism হল এর হাতিয়ার এবং রাজনৈতিক অজ্ঞতা ও ভাবালুতায় সুযোগে বিভিন্ন ফ্যাসিষ্ট গণসংগঠনের সাহায্যে বিপ্লবী আন্দোলনকে নির্ব্বিচারে নিশ্চিহ্ন করাই হল এর বিশেষত্ব। ভারতীয় রাষ্ট্রে এর কোনটির অভাব ত নেই বরং সবকয়টা পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান।

লেখিকা—গায়ত্রী দাশগুপ্তা
সহসম্পাদিকা, উইমেন্স কালচারাল এসোসিয়েশন

নারী আন্দোলন বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশ

নর ও নারীর সমন্বয়েই সমাজ গঠিত। সুতরাং সমাজের ওপর যে দাবী, তাকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার যে গুরুদায়িত্ব পুরুষের আছে, সমাজের অন্য অংশ হিসাবে নারীরও তা থাকতে বাধ্য। কোন কারণেই নারীকে তা থেকে বঞ্চিত করা চলতে পারে না। বরং সমাজের অর্দ্ধাংশ যদি সামাজিক অগ্রগতিতে অংশ গ্রহণ না করে তাহলে সে সমাজ উন্নত হতেই পারে না, অতীতের কুসংস্কারের গণ্ডীতে তার এক বিরাট অংশ বাঁধা পড়ে থাকবেই। সুতরাং সত্যই সমাজের অগ্রগতি চাইলে নারীকে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রের বাইরে জোর করে রেখে দেওয়া চলে না। দেশের অধিক সংখ্যক জনসাধারণ আজ শোষণের চাপে মুমূর্ষু, পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই, মনে শান্তি নেই—অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা করে নিস্কৃতি খোঁজে মেহনতী মানুষ। নারী কি এই শোষণ আর জুলুমের বাইরে? অর্থের অভাবে দেশের লোকের শিক্ষার সুযোগ নেই, দিনের পর দিন স্কুল কলেজের বেতন বেড়ে চলেছে অন্যদিকে প্রকৃত আয় প্রত্যেক মাসে কমে যাচ্ছে নেতাদের শাসন নীতির দৌলতে। নারীর কি এই দুর্ভোগ ভুগতে হয় না? সরকারী অব্যবস্থা দুর্নীতি আর কুশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে নারীর বুকে গুলি বর্ষণ কি হয় না? কোন দিক থেকেই নারী সমাজ এই অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলি থেকে মুক্ত নয় উপরন্তু তার নিজস্ব সমস্যাও আছে। সে সমস্যার সমাধান বর্ত্তমান সামাজিক কাঠামোর মধ্যে থেকে সম্ভব নয়। তাই তা থেকে মুক্তি পেতে হলে রাজনৈতিক সংগ্রাম অপরিহার্য্য। বস্তুত: মেয়েদের সমস্যাগুলি দেশের বৃহত্তর সমস্যা থেকে আলাদা করে দেখা যায় না বরং তার সমাধান শেষোক্ত গুলির সমাধানের ওপর নির্ভর করে। সুতরাং বিপ্লবী সংগ্রামের সফলতার ওপর নির্ভর করছে নারী সমাজের প্রকৃত মুক্তি।

নারীর পরাধীনতার ইতিহাস

মেয়েদের বর্ত্তমান পরাধীনতার মূল অনুসন্ধান করলে একটা জিনিষ যা চোখে পড়ে তা হল, মেয়েরা চিরদিনই এমনি পরাধীন ছিল না। সমাজ একদিনেই বর্ত্তমান স্তরে এসে পৌঁছায় নি—এই স্তরে আসার পিছনে সে রেখে এসেছে অতিক্রান্ত এক বিরাট দীর্ঘ পথ। এই পথেই মিলবে নারীর পরাধীনতার কারণ। মানব ইতিহাসের গোড়ার কথা হল, অধিকতর ভালভাবে বেঁচে থাকবার তাগিদ। এই তাগিদই তাকে দলবদ্ধভাবে বাস করতে শিক্ষা দিয়েছিল। সেই আদিম অসভ্য যুগে যখন আমাদের পূর্ব পুরুষরা বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন, পশু শিকার করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতেন তখন নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন অধিকারগত বৈষম্য ছিল না; বরং গোষ্ঠিগত বিবাহ প্রথা চালু থাকার দরুণ সমাজে নারীর স্থান ছিল পুরুষের চেয়ে সম্মানজনক। কারণ গোষ্ঠিগত বিবাহ প্রথা চালু থাকার ফলে কোন একটি সন্তানের মাকে জানা গেলেও পিতাকে সঠিক ভাবে জানা সম্ভব ছিল না তাই সন্তানের বংশ পরাম্পরা নির্দ্ধারিত হত মায়ের দিক থেকে। এই ভাবে অসভ্য যুগে নারী যে শুধু স্বাধীনই ছিল তা নয়, সে পুরুষের চেয়েও বেশী সম্মানার্হ ও ছিল।

সমাজ সর্বদাই গতিশীল। মানবসমাজও এই আদিম অসভ্য যুগে থেমে রইল না। সুতরাং ক্রমে ক্রমে প্রাকৃতিক শক্তি ও জীব জন্তুকে মানুষ তার আপন প্রয়োজনে কাজে লাগাতে সুরু করল। অসভ্য যুগের পর এল বর্বর যুগ। অসভ্য যুগে ধন দৌলত বলতে, ঘরবাড়ী, পোষাক পরিচ্ছদ, খাদ্য দ্রব্য উৎপাদন ও সংগ্রহের হাতিয়ারই বোঝাত; আর সমাজে বাড়তি উৎপাদনও ছিল না কিন্তু বর্বর যুগের তৃণভূমির বাসিন্দারা গৃহপালিত পশুর মালিক হতে আরম্ভ করল; নিত্য খাদ্যান্বেষণের দরকার রইল না প্রচুর দুধ ও মাংসের জন্য গৃহপালিত পশুগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণই হয়ে পড়ল প্রধান কাজ। সমাজে বাড়তি উৎপাদন অল্প অল্প দেখা দিল ফলে এল বিনিময় প্রথা। গোষ্ঠিগত সম্পত্তি রূপ নিল ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে; পরিবারে প্রধান হয়ে উঠল সম্পত্তির মালিক। নানা বিধি নিষেধের ফলে গোষ্ঠিগত বিবাহ পদ্ধতি ভেঙ্গে গিয়ে তার স্থান দখল করল এক স্ত্রী যুগ্ম বিবাহ পদ্ধতি, স্বাভাবিক মায়ের পাশে স্বাভাবিক পিতাও এসে গেল। অসভ্য যোদ্ধা এবং শিকারী এতকাল নারীর অধীনে দ্বিতীয় স্থান নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল কিন্তু শান্ত মেষপালক ধনগর্বে নিজেকে সে অবস্থায় রাখতে রাজী হল না। কিন্তু তবুও মায়ের দিক থেকে বংশ পরম্পরা ধরা হত বলে নারীর স্থান অসম্মানীয় ছিল না। তৎকালীন সমাজের শ্রমবিভাগ অনুযায়ী খাদ্য ও তার জন্য হাতিয়ার সংগ্রহের ভার ছিল পুরুষের ওপর এবং এ সবের মালিকও ছিল সে আর স্ত্রীর অধিকারে থাকত গৃহ সামগ্রী।

মানুষের চিন্তাশক্তি একদিনের জন্য বসে রইল না; তারা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলল ক্রম আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। ধীরে ধীরে কৃষি, হস্তশিল্প, তাঁত, অলঙ্কার এবং সাজসজ্জার জন্য সোনারূপার ব্যবহার প্রভৃতি বিশেষ উন্নতি লাভ করল। এইরূপে সমাজের উৎপাদনশক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধনদৌলতও বৃদ্ধি হল এবং

মধ্যবিত্তের বিপ্লবী সংগ্রামে জয়লাভেই আসতে পারে

কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হবার দরুণ সমাজে গুরুত্ব পূর্ণ শ্রম বিভাগ দেখা দিল। শ্রম বিভাগেরই ফল—মনিব ও দাস, শোষক ও শোষিত শ্রেণীর জন্ম। কিন্তু সমাজের এই অগ্রগতির মধ্যে ধনদৌলত অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্কের ওপর দিয়ে এক বিপ্লব ঘটে গেল। সমাজের এই অগ্রগতিই এনে দিল নারীর পরাধীনতা। কেন না সমাজ যতই উন্নতির পথে এগিয়ে চলল পুরুষের কর্মক্ষেত্রও ততই বিস্তৃত হতে লাগল এবং পরিবারে পুরুষের স্থান স্ত্রী অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ল। এই সমাজিক অবস্থায় পুরুষের মনে এক নতুন চিন্তার উদ্ভব হল। সে চাইল তার স্বোপার্জিত ধন দৌলত তার নিজের সন্তানরা ভোগ করবে। কিন্তু মাতৃ প্রধান সমাজে তা সম্ভব ছিল না তাই পুরুষ আদিম অধিকারের নিয়ম পালটিয়ে পিতার দিক থেকে বংশ পরম্পরা ও উত্তরাধিকার বিধি প্রবর্ত্তিত করল। ফলে সমাজে পুরুষের একাধিপত্যের কাছে নারীর স্বাধীনতা বিসর্জিত হল—পুরুষ ঘরে বাইরে কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করল।

এর পরের ইতিহাস হল নারীর ক্রম পরাধীনতার ইতিহাস। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর ব্যর্থতাই তাকে পরাধীনতার শিকলে বেঁধে দিল। অর্থনৈতিক কাঠামোকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে মানুষের চিন্তা, তার সংস্কৃতি, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। অর্থনৈতিক সম্বন্ধের পরিবর্তনের সাথে তাই এই গুলির পরিবর্তন ঘটে যায়। তাই উনবিংশতাব্দীতে বিভিন্ন দেশে সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করে বুর্জোয়াশ্রেণী যে বুর্জোয়া রাষ্ট্র গড়ে তুলল তা ধনতন্ত্রের নিজের সুবিধার জন্য মুক্ত করল মানুষকে দাস প্রথা থেকে, নারীর দাবী ও অধিকার অনেকাংশে স্বীকার করে নিল। কিন্তু যেহেতু এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে শোষণ ব্যবস্থার উচ্ছেদ হল না বরং এক নতুন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নতুন রূপে প্রতিষ্ঠিত হল তাই মানুষও আইনতঃ স্বাধীন বলে স্বীকৃত হয়েও কার্য্যতঃ মজুরীর দাসত্বে বাঁধা পড়ে গেল। নারীর দাবীও তাই আগেকার চেয়ে অনেকখানি পরিবর্দ্ধিত হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলেও নারী স্বাধীন হল না। স্বাধীনতা ও পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার কাগজপত্রে স্বীকৃত হয়েও উৎপাদন ব্যবস্থার অসামঞ্জস্যের জন্য সে যে তিমিরে ছিল তা থেকে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারল না।

আমাদের দেশে নারীর সামাজিক অবস্থা আরও জটিলরূপ নিয়েছে। পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব স্বাভাবিক ভাবে ঘটা নেবার জন্য বুর্জোয়া শ্রেণীর যতটা প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল আমাদের দেশে তা রইল না। ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদ আর সামন্ততন্ত্র-এই দুই বিরুদ্ধে শক্তির সঙ্গে আপোষ করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তার স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হল। সামাজিক মনের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সে রয়ে গেল সেই মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক যুগে। মেয়েরাও তাই সঙ্কীর্ণ সামাজিকগণ্ডী আর কুসংস্কারের বেড়াজালে আটকা পড়ে রইল।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা একমাত্র মুক্তি আনতে পারে

আজ নারীকে স্বাধীন বলে বলা হয় অথচ পুরোপুরি ক্রিয়তে ভার্য্যা এই হল দৃষ্টি ভঙ্গি। সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় জমি ও কলকারখানা যেমন শোষক শ্রেণীর উৎপাদন যন্ত্র নারীও তেমনি পুরুষের সন্তানোৎপাদনের যন্ত্র। এই হল দৃষ্টিভঙ্গী। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় এক স্ত্রী বিবাহ আইনত স্বীকৃত হয়েছে কিন্তু সমাজে যা চলেছে তা হল পুরুষের বেলায় বহু স্ত্রী বিবাহ। আর আমাদের দেশে অবস্থা আরও জঘন্য। বিবাহযোগ্য কন্যাকে গলগ্রহ মনে করা হয়, বিবাহের সময় তারই প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে কন্যার অভিভাবককে দিতে হয় প্রচুর পণ। যেদেশে নারীকে গরু ছাগল জাতীয় অবলা জীব বলে বিবেচনা করা হয় সেই দেশে পুরুষরা বিবাহের সময় যে সেই সব অবলা জীবদের ভরণপোষণের জন্য মোটা টাকা দাবী করবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। গরু বাছুর কেনার সময় আমরা দেখে নি যাতে পালন করলে লাভ হয়। মেয়েদের বেলায় পুরুষরাও তাই দেখে নেয় আমাদের দেশে। শুধু হা হুতাশে বা পার্লামেণ্ট আইন পাশ করিয়ে এ অবস্থার প্রতিকার হবে না। এর প্রতিকার একমাত্র আসতে পারে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ওপর।

এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বাগ্রে দরকার নারীকে সামাজিক উৎপাদনে ফিরিয়ে আনা অথচ গৃহে যতদিন পুরুষের অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততদিন গৃহস্থালীর কাজকে সামাজিক উৎপাদনের পর্য্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব নয়। একমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সমানাধিকার থাকলে গৃহস্থালীর কাজ সম্মানজনক হতে পারে। নয়ত যতই না কেন "গৃহিণী, সচিব মিত্র" বলে চেঁচান হোক স্ত্রী আদতে দাসী বাঁদীই থেকে যাবে।

শোষিতের সংগ্রামেরই পরিপূরক

আবার এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এমনি এমনি আসবে না। তার জন্য সংগ্রামের প্রয়োজন। আর এই সংগ্রামের বিরোধীতা করবে বর্ত্তমানে সমাজের কায়েমীস্বার্থ সম্পন্ন শ্রেণী। সুতরাং সেই সংগ্রাম আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করতে বাধ্য। কিন্তু একথাও ঠিক সমাজের অগ্রগতিকে ধনিক শ্রেণী রোধ করতে পারবে না। কোটি কোটি শোষিত মানুষ—শ্রমিক, কৃষক, নিম্ন মধ্যবিত্ত বর্ত্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোকে ভেঙ্গে ফেলে শোষণহীণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম করে চলেছে। এই সংগ্রামে জয়লাভ করতে পারলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্বন্ধ দূর হয়ে গড়ে উঠবে সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা, শোষণ হীণ রাষ্ট্র ব্যবস্থা। সেই খানেই প্রত্যেকটী নারীর মর্য্যাদা স্বীকৃত হতে পারে। তাই সর্ব্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত শোষিত শ্রেণী উপশ্রেণীদের মিলিত বিপ্লবী সংগ্রামের পরিপূরক হিসাবেই সংগঠিত করতে হবে নারী আন্দোলন। এ চিন্তাকে বাধা দেবে ককটেল পার্টি ও বলড্যান্সের মধ্যে নারী আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ রাখতে চায় যারা এমন সব বিকৃতরুচী, যৌন বিকারগ্রস্থদের দল বল। তাতে হতাশ হলে চলবে না। স্বাধীনভাবে, সমান মর্য্যাদা নিয়ে মানুষের মত বাঁচতে হলে সংগ্রাম করতেই হবে।

সর্ব্ব ভারতীয় ছাত্র সম্মেলন

বামপন্থী ছাত্রদের সংগ্রামী ঐক্য ছাত্রসমাজকে প্রকৃত নেতৃত্ব দিবে

গত ২৯শে, ৩০শে ও ৩১শে অক্টোবর কলিকাতায় সর্ব্বভারতীয় ছাত্রসম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। একটি যুক্ত ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠনের চেষ্টা বহুদিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছিল। বিশেষতঃ গত জুলাই মাসে বামপন্থী যুক্ত ফ্রন্টের অধিবেশনে যুক্ত ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগ করা হইয়াছিল। এই চেষ্টাই গত অক্টোবরের সম্মেলনে কার্য্যকরী রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই সম্মেলনে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার, বলসেভিক পার্টি। বিপ্লবী সাম্যবাদী দল, ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজেণ্টস লীগ, ফরোয়ার্ড ব্লক, (মার্কসপন্থী) বলশেভিক মজদুর পার্টি, ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজেণ্টস পার্টি, বিপ্লবী সাধারণ তন্ত্রী দল, রেভলিউশনারী ওয়ার্কার্স পার্টি প্রভৃতি মোট তেরটি প্রতিষ্ঠানের ছাত্র প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। যুক্ত সমাজতান্ত্রিক ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠন সম্পর্কে সকলেই একমত হইয়াছেন। এই কাজকে আগাইয়া লইয়া যাওয়ার জন্য সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি আর্গানাইজিং কমিটি গঠিত হইয়াছে। কমরেড্ দেবেশ দাস ও কমরেড্ প্রনব গাঙ্গুলী, যুগ্ম সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। যুক্ত ছাত্র প্রতিষ্ঠানের আগামী সম্মেলনের গঠণতন্ত্র প্রস্তুত করার জন্য একটি ড্রফটিং কমিটি গঠিত হইয়াছে। সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার ছাত্র ব্যুরোর সম্পাদক, কমরেড্ সুকোমল দাস গুপ্ত ইহার কনভেনর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সমস্ত বামপন্থী ছাত্র ঐক্যের যে গুরু দায়িত্ব রহিয়াছে আশা করা যায় সেই প্রচেষ্টায় সকলেই সমান ভাবে আগাইয়া আসিবেন।

—আলোঘর—

৪১।১এ, রসা রোড সাউথ, (টালিগঞ্জ রেল পুলের পাশে)

যাবতীয় ইলেক্‌ট্রিকের সরঞ্জাম পাওয়া যায়

★

আমাদের বিশেষত্ব ঃ—

পাখা ও মোটর মেরামত, ফ্লোরোসেণ্ট টিউব ও চোক ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়।

মাইক ও এম্‌প্লিফায়ার ভাড়া দেওয়া হয়।

ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী ছাত্র শক্তিই কেবলমাত্র

লেখক—সুকোমল দাশগুপ্ত
সাধারণ সম্পাদক, সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার ছাত্র ব্যুরো

ভারতবর্ষ থেকে বিদেশী শাসন দূর করার উদ্দেশ্যে দীর্ঘ ষাট বছর ধরে যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন চলেছিল তার প্রধান শক্তি ছিল ভারতীয় যুব সম্প্রদায় বিশেষ করে ছাত্রসমাজ। যখনই তাদের কাছে সংগ্রামের আহ্বান এসেছে তখনই তারা স্কুল, কলেজ ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আন্দোলনের আবর্তে, হাসিমুখে সমস্ত কিছু অত্যাচার সহ্য করেছে, কারাবরণ থেকে আরম্ভ করে ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে এতটুকুও দ্বিধা করে নি কোন দিন। আর এই ত্যাগ স্বীকারই বড় কথা নয়; ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের ধারক ও বাহক ছাত্ররাই। কংগ্রেসের গোড়ার আবেদন নিবেদনের যুগ পালটিয়ে আন্দোলনের যুগের প্রবর্ত্তন করেছিল এই ছাত্ররা; তার পর একটার পর একটা দেশজোড়া আন্দোলনের বন্যা যখনই এসেছে ছাত্ররা তাকে সফলভাবে লক্ষ্যের দিকে চালিত করতে চেয়েছে আবার যখন গণ-অভ্যুত্থান ও বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার ভয়ে এই দেশের ধনিক-শ্রেণীর মুখপাত্র কংগ্রেসী নেতৃত্ব সেই আন্দোলনগুলিকে পিছন থেকে আঘাত হেনে অর্দ্ধপথে থামিয়ে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ করেছে তখনও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলেছে ছাত্ররাই। তার পর জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এবং তার বাইরে এই দেশে যে সাম্যবাদী আন্দোলন ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তাতেও ছাত্রদের অবদান সামান্য নয়। এমনি করেই যুগে যুগে ভারতীয় ছাত্র সমাজ বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা বয়ে নিয়ে চলেছে। সংগ্রামের মহড়া দেবার সময় জাতীয় কংগ্রেসী নেতারা ছাত্রদের এই সংগ্রামী মনোভাব ও ত্যাগস্বীকারের যথেষ্ট তারিফ করে তাদের উদ্দীপ্ত করেছিলেন, তাদের অভিনন্দন দিতে কার্পণ্য করেন নি বরং জাতীয় আন্দোলনের প্রকৃত নিঃস্বার্থ সৈনিক ও শক্তি হিসাবেই অভিহিত করেছিলেন।

ছাত্র সমাজ ও রাজনীতি

আজ সেদিন বদলে গিয়েছে। ১৯৪৭ সালে নেতাদের হাতে দেশ শাসনের ভার আসার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিপ্লবী ছাত্র সমাজের রাতারাতি রং গেল বদলিয়ে নেতাদের চোখে তারা হয়ে পড়ল উচ্ছৃঙ্খল জনতা। তাই তাদের ওপর কঠোর নিপীড়ন চালাতে বাধল না নেতাদের। নিপীড়ন, অত্যাচার ও জুলুমকে ছাত্ররা ভয় করে নি কোন দিন; তার বিভৎস রূপ তারা ভালভাবেই প্রত্যক্ষ করেছে বৃটীশ শাসনের আমলে। তাই এই সন্ত্রাসবাদী শাসনে ছাত্র সমাজকে ভয় দেখিয়ে জয় করার চেষ্টা ব্যর্থ হল বরং সংগ্রামী ছাত্র সমাজের মনকে তা আরও দৃঢ় করে তুলল। অবশ্য একথা ঠিক—এই ফ্যাসিবাদী আক্রমণে বহু দুর্বল চিত্ত ছাত্র পেছিয়ে গেল কিন্তু সাধারণভাবে তাতে ছাত্র শক্তি এমন কিছু দুর্ব্বল হয় নি। নেতাদের এই ব্যর্থতা তাঁদের নতুন পথ নিতে বাধ্য করল। চলল কূট কৌশলপূর্ণ প্রচার, চেষ্টা চলতে লাগল ভুল বুঝিয়ে ছাত্রদের বিপ্লবী রাজনীতি থেকে সরিয়ে বর্ত্তমান ব্যবস্থার সমর্থনে টেনে আনা। সে চেষ্টা এখনও চলছে। তাই বড় বড় কংগ্রেসী নেতা হতে আরম্ভ করে তাঁদেরই কার্য্যতঃ দালাল জয়প্রকাশী সমাজতন্ত্রী নেতারা সকলেই উঠে পড়ে অপপ্রচারে নেমেছেন আর ছাত্রদের উপদেশ দিচ্ছেন—"ছাত্ররা সমস্ত রকম রাজনৈতিক ও উত্তেজনামূলক আন্দোলনে লিপ্ত না থেকে গঠনমূলক কাজকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করবে।" এ উপদেশ দেবার উদ্দেশ্য হল, বিরাট ছাত্র সমাজকে জঙ্গী আন্দোলনের বাইরে নিয়ে এসে তাকে বর্ত্তমান ধনিক শ্রেণীর রাষ্ট্রের সহায়ক শক্তি হিসাবে টেনে আনা।

এই বিষয়ে প্রথম প্রশ্ন জাগে যে, কারও পক্ষে কি রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভব আজ? দেখা যাক ব্যাপার কি দাঁড়ায়। নেতারা উপদেশ দিচ্ছেন রাজনৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত না হয়ে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে। গঠনমূলক কাজের অর্থ বর্ত্তমান সমাজের কাজ করে যাওয়া, নেতাদের রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক কাজকর্ম্মে সাহায্য করা। কিন্তু এ কাজও ত রাজনীতি বিবর্জ্জিত নয়: কারণ শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শাসন, শ্রেণীশাসন হতে বাধ্য আর বর্ত্তমান ভারতীয় রাষ্ট্র যে ধনিক-শ্রেণীর রাষ্ট্র তা হাজার হাজার উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং সেই রাষ্ট্রকে সাহায্য করার অর্থ বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করা, তার শ্রেণী শোষণকে স্বীকার করে নিয়ে তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করা সেই শোষণ অব্যহত রাখার অস্ত্র রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা করে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করা। পুঁজিবাদের লক্ষ্য হল মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মুনাফার উদ্দেশ্যে দেশের বিরাট বৃহত্তর অংশকে শোষণ; সুতরাং সেই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করা নিশ্চয়ই প্রতিক্রিয়াশীল। তা হলে পরিষ্কার ভাবে দেখা গেল নেতাদের বক্তব্যের আসল অর্থ হল—ছাত্ররা রাজনীতি করুক তাতে আপত্তি নেই তবে সে রাজনীতি যেন প্রতিক্রিয়াকে সাহায্য করে, নেতাদের শ্রেণী শাসনও শোষণকে শক্তিশালী করে।

আর নিজেদের প্রগতিবাদী ছাত্র বলে দাবী করতে হলে আজ কি জঙ্গী আন্দোলন থেকে সরে থাকা যায়? এর একমাত্র উত্তর হল, না। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ছাত্ররা যোগ দিয়েছিল কারণ তারা বুঝেছিল, যতদিন বিদেশী শাসন ও শোষণ দেশের মাথার ওপর চেপে থাকবে ততদিন দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। দেশ বলতে তারা বুঝেছিল দেশের লোক; আর দেশের লোকের উন্নতি বললে বোঝায় দেশের বেশীর ভাগ লোকের উন্নতি। প্রত্যেক দেশেরই বেশীর ভাগ লোক হচ্ছে মেহনতী মানুষ, মজুর, চাষী, মধ্যবিত্ত। তাই স্বাধীনতার অর্থও তাদের কাছে ছিল—এই বৃহত্তর জনসমাজের প্রকৃত উন্নতি, সমস্ত রকম শোষণ মুক্ত এক সুখী সমাজ ব্যবস্থা। তাদের এই লক্ষ্যের বদলে স্বাধীনতার নামে দেশে যা চলছে তা শুধু প্রত্যক্ষ বিদেশী শাসনের অনুপস্থিতি। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ আজও তেমনি আছে, পুঁজিবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণ অব্যহত। সুতরাং ছাত্র সমাজ যার জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করেছিল তা যখন এখন প্রতিষ্ঠিত হয়নি তখন তাদের সেই জঙ্গী আন্দোলনও থেমে যেতে পারে না।

এই বৃহত্তর লক্ষ্যের সাথে সাথে ছাত্রদের নিজস্ব দাবী দাওয়াও ছিল। তারা চেয়েছিল এই শিক্ষাব্যবস্থা আমূল পালটিয়ে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করতে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মানুষকে প্রকৃত মানুষ করা। এ দেশে সাম্রাজ্যবাদ যে শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে তুলেছিল নিজের স্বার্থের খাতিরে তা সে শিক্ষা নয়। বর্ত্তমানে কলকারখানা যেমন Large Scale উৎপাদনের যন্ত্র, বিশ্ব-বিদ্যালয়ও তেমনি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী স্বার্থে আমলাতন্ত্র সৃষ্টি, কেরাণীর দল জন্য দেবার যন্ত্র। এই ঘুণেধরা শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্ত্তন নেতারাও দাবী করেছিলেন ক্ষমতা হস্তগত করার আগে কিন্তু ক্ষমতা হস্তগত করার পর থেকে আগের দিনের প্রতিশ্রুতি আর অঙ্গীকারের কোন মূল্যই নেতারা দেন না; শিক্ষা খাতেও দেননি ফলে অতীতের সেই জীর্ণ বস্তাপচা সমাজবিরোধী শিক্ষা ব্যবস্থা আজও চালু রয়েছে। একে পরিবর্ত্তন করতে হলে আন্দোলন করতে হবে; আর সে আন্দোলনকে প্রাণপনে বাধা দেবে বর্ত্তমান সমাজের কায়েমী স্বার্থ সম্পন্ন শ্রেণী। স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে ছাত্রদের নিজস্ব দাবী দাওয়ার আন্দোলনও তাই রাজনৈতিক রূপ নিতে বাধ্য। শুধু তাই নয়; ছাত্ররা মানুষ—তাদের খেয়ে পরে বাঁচতে হয়, তাদেরও বাপ, মা, ভাই, বোন আছে, তাদের সুখদুঃখের সঙ্গে ছাত্ররাও জড়িত। অথচ সরকারী তথ্য সরবরাহ বিভাগও প্রচার করতে বাধ্য হয়েছে, পুষ্টিকর আহারের অভাবে ছাত্রদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে শতকরা ৬০ জনের বেশী কোন না কোন ক্ষয়বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত। দিনের পর দিন অভিভাবকদের আয় কমে যাচ্ছে তার ফল হিসাবে অর্থের অভাবে অসংখ্য ছাত্রের পড়াশোনা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে—এ কথা বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও স্বীকার করেছে। কেন এই দুরবস্থা; কি করলে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়—এই সব একান্ত জরুরী ও জীবন সম্পর্কীয় প্রশ্নের সঠিক জবাব খুঁজতে গেলেই টান পড়ে রাজনীতির আর সেই অত্যাচারের প্রতিকারে এগিয়ে এলে ত কথাই নেই। বর্ত্তমান সমাজের কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে হয়; তাদেরই রাষ্ট্র তার পুলিশ, সৈন্যবাহিনী আর নানা সন্ত্রাসবাদী আইনের অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে আসে সংগ্রামী জনতার বিরুদ্ধে। অত্যাচার ও নিষ্পেষণে নিশ্চিহ্ন করে দেয় তাদের। সংগ্রাম রাজনৈতিক রূপ না নিয়ে পারে না। সুতরাং রাজনীতি বিমুক্ত হয়ে থাকতে আজ কেউ পারে না; ছাত্রদের পক্ষে ও তা অসম্ভব। কোন দেশের সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতি পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, একটিকে আঘাত হানতে হলে অন্যটিকে আঘাত না হেনে উপায় নেই। তাই কোন রকমেই ছাত্র সমাজ রাজনীতি থেকে নির্লিপ্ত থাকতে পারে না।

ফ্যাসিবাদী অপকৌশল

কিন্তু আদতে নেতারা ছাত্রদের নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে চান তাই রাজনীতি পরিত্যাগ করার জন্য তাদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। আজ

ফ্যাসিষ্ট সংগঠন—জাতীয়-

ছাত্রদের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে পারে

প্রতিটি দেশে গণতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদ সমাজ তন্ত্র ও পুঁজিবাদ, শোষিত জনতা ও মুষ্টিমেয় শোষকের মধ্যে যে সংগ্রাম চলেছে তার জোয়ার আমাদের দেশেও এসেছে। আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই শ্রেণীসংগ্রাম তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হিসাবে রূপ নিতে চলেছে। প্রত্যেক দেশের ফ্যাসিষ্টরা তাই তাদের শক্তি বাড়াবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে ফ্যাসিবাদী দেশের প্রভেদ হল এই যে, ফ্যাসিবাদ জানে ধনতান্ত্রিক শোষণে বিক্ষুব্ধ জনতার আক্রমণ থেকে বাঁচতে হলে শুধু মাত্র রাষ্ট্র ক্ষমতার উপর নির্ভর করলে চলবে না, জনতার মধ্যে ফ্যাসিষ্ট সংঘ শক্তি গড়ে তুলতে হবে। এই ফ্যাসিষ্ট সংঘের কাজ হল জনতার সঙ্গে মিশে প্রয়োজন হলে মিথ্যা লড়াই এর ভূমিকা করে জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জ্জন করা এবং অন্যান্য গণপ্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বিপ্লবী চিন্তায় বিশ্বাসী প্রতিষ্ঠান গুলিকে দেশদ্রোহী ও জনস্বার্থ বিরোধী বলে বর্ব্বরোচিত উপায়ে দমন করা। ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রও সেই পথে চলেছে। শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে মুখে গান্ধীয় সমাজতন্ত্রের কথা বলে শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট ভাঙ্গার যে কাজ করে চলেছে আই, এন টি,ইউ, সি, কৃষক আন্দোলনে অধ্যাপক রঙ্গ প্রভৃতিরা যে কৌশলে জমিদার, জোতদার, পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছেন, ঠিক সেই কৌশল এবার ছাত্রদের মধ্যে চালাবার চেষ্টা হচ্ছে। ফ্যাসিষ্ট সংঘ জনসাধারণের প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে গড়ে তোলা হচ্ছে এবং আরও হবে। এই উদ্দেশ্যেই National Students' Union বা জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের জন্ম। নাৎসী হিটলার, ফ্যাসিষ্ট মুসোলিনীও এমনি করেই Fascist Students' Organisation গড়ে তুলেছিল।

এই জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোক্তাদের মধ্যে আছে খাঁটী কংগ্রেসীরা আর জয়প্রকাশী সমাজতন্ত্রীরা। আই, এন, টি, ইউ, সির সঙ্গে হিন্দ মজদুর সভার একত্রে ধর্ম্মঘট ভাঙ্গতে আপত্তি নেই। তা তারা বহুবার করেছেও। উভয়ের মধ্যে চুক্তি হয়েছে—কেউ কাউকে আক্রমণ করবে না যার পরিষ্কার মানে হল, ফ্যাসিষ্ট শ্রমিক সংঘকে এমন কি কথার মারফৎ জন সমক্ষে প্রকাশ করার কাজটুকু করতেও জয়প্রকাশীরা নারাজ। এই রকম অভিন্ন হৃদয় বন্ধুরা যে ছাত্রদের মধ্যে একত্রিত হবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? এই সব কংগ্রেসপন্থী আর নামধারী সমাজতন্ত্রী নেতারা গলাবাজী করে বলছেন—"ছাত্র সমাজ বিভেদ বিসংবাদে ছিন্নভিন্ন, তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। সেই ছাত্র ঐক্য গড়বার উদ্দেশ্যে কলেজ ইউনিয়নগুলির ভিত্তিতে জাতীয় ছাত্রইউনিয়ন গড়া হবে।" ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধ নয়, তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে—এ সব খুব ভাল কথা। কিন্তু কেন? ঐক্যবদ্ধতার জন্যই কি ঐক্যবদ্ধতা গড়ার প্রয়োজন? না তার আরও বৃহত্তর উদ্দেশ্য আছে? এইখানেই যত গলদ। জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের পাণ্ডারা ছাত্র আন্দোলনকে রাজনীতি বিবর্জিত করার কথা বলে ধনিক শ্রেণীর শাসকদের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিকে ছাত্রদের দিয়ে স্বীকার ও তাকে সমর্থন করবার চেষ্টা করছে।

এ চেষ্টা নতুন নয়

যবে থেকে দেশশাসনের ভার জাতীয় নেতৃবৃন্দের হাতে এসেছে তবে থেকেই চেষ্টা চলেছে ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে ঐক্যের কথা বলে নতুন করে বিভেদ আনার, ছাত্র শক্তির মধ্যে ফ্যাসিষ্টদের সংঘ গড়ে তোলার। ১৯৪৭ সালের শেষের দিক থেকে ছাত্র কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব রাজনীতি বিরহিত জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন গড়ার কথা বলে আসছে। তখন তাদের বক্তব্য ছিল—যেহেতু স্বাধীনতার লড়াই সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে সেই হেতু ছাত্রদেরও রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের কোন প্রয়োজন নেই। কে বলল স্বাধীনতার লড়াই সমাপ্ত হয়েছে? শ্রেণী বিভক্ত সমাজে এক শ্রেণীর স্বাধীনতাকে অন্য শ্রেণীর স্বাধীনতা বলা যায় না। ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর স্বাধীনতা মিলেছে সন্দেহ নেই কিন্তু সেই স্বাধীনতা আসার অর্থ কোটী কোটী মেহনতী শোষিত ভারতবাসীর স্বাধীনতা নয় বরং তার উল্টাটাই। ভারতবর্ষের শ্রমজীবী জনতা যে জন্য জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল তার কিছুই প্রতিষ্ঠিত হয় নি; তাই তারা ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রুজি, রুটি, জমি ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য লড়াই করে চলেছে। প্রগতিবাদী বলে পরিচয় দিতে হলে এই আন্দোলন থেকে দূরে থাকলে চলবে না। সুতরাং ছাত্রদেরও তাই পথ বেছে নিতে হবে—কোন শিবিরে তারা যাবে, প্রতিক্রিয়ার না প্রগতির শিবিরে। যে কোন একটাতে যোগ দেওয়াই হল রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ যোগ; আর নিরপেক্ষ থাকার অর্থ বর্ত্তমান প্রতিক্রিয়ার রাজত্ব অক্ষুণ্ণ থাকতে অপ্রত্যক্ষ সাহায্য; সেই হিসাবে রাজনীতিতে অপ্রত্যক্ষযোগ।

তারপর কে না জানে, যে কলেজ ইউনিয়নগুলিকে ভিত্তি করে এই জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন গড়ে তোলা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল সেগুলির অধিকাংশই প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষাকর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত। তাই কংগ্রেসী ও জয়প্রকাশী ছাত্রনেতাদের আহ্বানে ছাত্রসমাজ সাড়া দেয় নি। ফলে আরও কৌশলপূর্ণ পথ এবার ধরা হল। ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে ছাত্র কংগ্রেস তার বাঙ্গালোর সম্মেলনে প্রস্তাব নিল—"যে সমস্ত বিষয়ের মধ্যে মতবিরোধ বা দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা আছে এমন সমস্ত ব্যাপার বাদ দিয়ে" জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন "সমস্ত আংশিক স্বার্থের উর্দ্ধে" থাকবে। অথচ ঐক্যবদ্ধতা গড়ে তোলার কথা বলছে যারা তারা হল বর্ত্তমান শাসক শ্রেণীর ফ্যাসিবাদী শাসন ও শোষণের সমর্থক। সুতরাং তাদের সঙ্গে মূলগত দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকায় প্রত্যেকটি বিষয়েই মতভেদ দেখা দিতে বাধ্য। শ্রমজীবি জনতার রুজি, রুটি ওগণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী, ছাত্রদের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের দাবী সমস্ত বিষয়েই মতভেদ দেখা দেবে ফলে এ সব বিষয় জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন কিছু করবে না। এইভাবে গোড়ায় রাজনীতি বিবর্জিত ছাত্র সংগঠন গড়ার যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল তা কার্য্যকরীরূপে অক্ষুণ্ণ রাখা হল, তবে স্পষ্ট উপায়ে নয় কৌশলে।

আর গঠন কৌশলও ঠিক আগের কায়দায়। প্রস্তাবে যদিও বলা হয়েছিল—"জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন বর্ত্তমানে কলেজ ইউনিয়নগুলি যে ভিত্তিতে আছে সেই ভিত্তিতে হবে না; গণতন্ত্রের আগুণে রূপান্তরিত নতুন ইউনিয়নের ভিত্তিতে" হবে অথচ এই গণতন্ত্রের আগুণের ছাত্রদের মধ্যে আগুণ না জেলে তাদের মধ্যে ধোঁয়া সৃষ্টি করার দিকে নজর হল বেশী। কারণ প্রস্তাবের অন্যত্র সরকারী কর্তৃপক্ষকে আবেদন করা হয়েছে তারা যেন এই গণতান্ত্রিক ইউনিয়নগুলি তাড়াতাড়ি গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। তা ত বটেই! যে ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্র মেহনতী মানুষের প্রাথমিক গণতান্ত্রিক অধিকার ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার পর্য্যন্ত অসংখ্য অর্ডিন্যান্স কালাকানুন ও লাঠি গুলি গ্যাসের জোরে কেড়ে নিয়েছে সেই রাষ্ট্রকেই যদি ছাত্রদের গণতান্ত্রিক ইউনিয়ন গড়ার জন্য অনুরোধ না করা হয় তাহলে আর কাকে করা যাবে? জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন গড়ার প্রস্তুতি কমিটিতে যে সমস্ত লোক আছেন তাঁহার নামের দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যাবে, ভারতীয় রাষ্ট্র জাতীয়তার নামে যেমন জাতির শতকরা ৯৯ জনকে শোষণ করছে, ইঙ্গমার্কিণ ফ্যাসিবাদী যুদ্ধশিবিরে তাঁবেদারী করছে, জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি যেমন

জাতীয়তার দোহাই পেড়ে ধনিকশ্রেণীর রক্ষিতার ভূমিকা পালন করছে তেমনি করে এই জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নও করতে চেষ্টা করবে। উপদেষ্টা কমিটিতে আছেন শঙ্কর রাও দেও, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, এস, কে, পাতিল, জাকির হোসেনের মত জাঁদরেল কংগ্রেসী ফ্যাসিষ্টদের মুখপাত্ররা, জয়প্রকাশ নারায়ণ, নরেন্দ্র দেও প্রভৃতি নামধারী সোস্যালিষ্ট ফ্যাসিষ্টদের দালালরা আর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বিভাগের বড় কর্ত্তা হুমায়ুন কবীরদের মত সুবিধাবাদীর দল। এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধতা গড়ার সোজা অর্থ হল—শ্রমিক, কৃষক, নিম্নমধ্যবিত্তদের স্বার্থ পুঁজিপতিদের পায়ে বিকিয়ে দেওয়ায়, শোষিত শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।

সংগ্রামী ঐক্যবদ্ধতাই ছাত্রদের বাঁচাতে পারে

ছাত্রদের মধ্যে বিভেদ ও বিসংবাদ যে ছাত্রশক্তিকে দুর্বল করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং সেই দুর্ব্বলতাকে কাটাবার জন্য ঐক্যবদ্ধ ছাত্র মোরচা গঠনের যে দরকার তাও কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কাদের নিয়ে এবং কেমন করে এই ঐক্যবদ্ধতা গড়ে তুলতে হবে? ছাত্রদের সমস্যাগুলি যেখানে দেশের বৃহত্তর সমস্যাগুলির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেখানে দেশের সেই বৃহত্তর রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রেই ছাত্রদের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান কেবলমাত্র সম্ভব। সুতরাং ছাত্র আন্দোলনের মূল লক্ষ্য তাই হবে রাজনৈতিক সংগ্রাম, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই। এই লড়াই শ্রমিক, কৃষক, প্রভৃতিরা নিজ নিজ শ্রেণী সংগঠনের মারফৎ লড়বে কিন্তু ছাত্ররা বিশেষ কোন শ্রেণীভুক্ত নয় বলে তাদের সেই রকম কোন শ্রেণী সংগঠন থাকতে পারে না। অথচ ছাত্র সমাজের এই লড়াইয়ে ভূমিকা আছে; প্রগতিবাদী হতে হলে তাকে শ্রমিক কৃষকের পাশে না লড়ে উপায় নেই আর লড়াইএর সব চেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র হল

(২৩এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ছাত্র-ইউনিয়নকে খতম কর

নভেম্বর বিপ্লবের ডাক—পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামী

লেখক ঃ—প্রীতিশ চন্দ
(কেন্দ্রীয় কমিটীর সভ্য)

নভেম্বর বিপ্লব কোন একটি বিশেষ জাতির সীমানার মধ্যে সংঘটিত বিপ্লব নয়। পৃথিবীর সকল দেশের মানবইতিহাসে ইহা এক নূতন মৌলিক পরিবর্ত্তন আনিয়াছে বলিয়া, পুরাতন জীর্ণ পুঁজিবাদী পৃথিবীকে নূতন সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় রূপান্তরের সূচনা করে বলিয়া ইহা আন্তর্জাতিক-বিশ্বব্যাপী বিপ্লব। মানুষের অগ্রগতির ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস; সমাজবিপ্লবের মধ্য দিয়াই আগাইয়া চলিয়াছে সমাজ ধাপে ধাপে। তাই ইতিহাসে বিপ্লবের উদাহরণের অভাব নাই। কিন্তু নভেম্বর বিপ্লবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যতগুলি বিপ্লব সংঘটিত হইল তাহার প্রত্যেকটিতে বিপ্লব সফল হইলেও শোষণের শেষ হয় নাই; শাসন ব্যবস্থার কর্ণধার হিসাবে একদল শোষকের বদলে আর একদল নূতন শোষক আসিয়াছে, একধরণের শোষণের পরিবর্ত্তে নূতন এক ধরণের শোষণ কায়েম হইয়াছে। ক্রীতদাসদের মুক্তিসংগ্রাম; ভূমিদাসদের বিদ্রোহ, গত শতাব্দীর বিখ্যাত গণতান্ত্রিক বিপ্লব—সকলগুলিরই সেই এক পরিণতি, শোষকের জাতি বদলাইলেও, শোষণের চরিত্র পরিবর্ত্তন হইলেও শোষণ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। নভেম্বর বিপ্লবই সর্বপ্রথম বিপ্লবের এই ব্যর্থতাকে দূর করিয়া শোষণমুক্ত সমাজ গড়িতে আরম্ভ করে। অন্যান্য বিপ্লবের সহিত নভেম্বর বিপ্লবের ইহাই প্রধান নীতিগত প্রভেদ। এবং এই কারণেই সমস্ত দুনিয়ার শোষিত মজদুর কৃষক নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণী উপশ্রেণী এই দিনটিকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে, নূতন করিয়া শপথ গ্রহণ করে, নূতন সামাজিক শ্রেণী সম্বন্ধের ভিত্তিতে সংগ্রামের কৌশল নির্ণয় করে সংগ্রাম করে।

ধনতন্ত্রের ধ্বংসের যুগ আনিয়াছে

এই কথা পূর্ব্বে প্রচার করাহইত যে, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদই জাতিগুলিকে মুক্ত করিবার একমাত্র উপায়। কিন্তু বাস্তবে ইহার বিপরীত অবস্থাই দেখা গিয়াছে; জাতিগুলিকে মুক্ত করিবার পরিবর্ত্তে উহা জাতিগুলির মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি করিয়াছে, বিভিন্ন দেশের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে শত্রুতা বাড়াইয়া তুলিয়া পুঁজিপতি ও জমিদার শ্রেণীর শোষণকে অব্যাহত রাখিয়াছে এবং পরিশেষে একটির পর একটি মারাত্মক যুদ্ধ বাধাইয়া সভ্যতা ও শান্তিকে বানচাল করিয়া দিয়াছে। নভেম্বর বিপ্লব বুর্জোয়া জাতীয়তার মুখোস ছিঁড়িয়া আন্তর্জাতিকতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। জমিদার ও পুঁজিপতিদের শোষণের শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া নভেম্বর বিপ্লব পৃথিবীর এক বিরাট অংশে ধনতন্ত্রের ধ্বংস করিয়াছে; উপরন্তু পশ্চাদপদ জাতিসমূহের বিশাল অংশকে স্বেচ্ছায় মুক্তি দিয়া ঔপনিবেশিক শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবের যুগও আনিয়াছে। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদের নিজের দেশে এবং তাহার উপনিবেশগুলিতে বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় বিশেষ করিয়া সেই বিপ্লবী প্রচেষ্টা কার্য্যকরভাবে পরিচালনার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় একদিকে সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক দেশের শ্রমিক ও অন্যান্য শোষিত শ্রেণী উপশ্রেণীগুলি যেমন দিনের পর দিন শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে অন্যদিকে তেমনই ধনতন্ত্রের সংকট তাহার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের ক্রম পরিণতি হিসাবেই তাহাকে ধ্বংসের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। তাই নভেম্বর বিপ্লবের আগে ধনতন্ত্রের যে স্থৈর্য্য, ভারসাম্য, স্থায়িত্ব প্রভৃতির কথা বলিয়া তাহাকে চিরস্থায়ী বলিয়া প্রচার করা হইত তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমানে ধনতন্ত্রকে আংশিকভাবে পুনর্গঠিত করার চেষ্টা হইতে পারে, ফ্যাসিবাদের পথে তাহার নিজস্ব দ্বন্দ্বকে কমাইবার প্রয়াস ও তাহার বিরুদ্ধ বিপ্লবী শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করার নীতি গ্রহণ করা যাইতে পারে কিন্তু প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের মধ্য দিয়া সর্ব্ব প্রথম শোষিত শ্রেণীর নিজস্ব রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর হইতে সামগ্রিকভাবে ধনতন্ত্রের যুগ কাটিয়া গিয়া তাহার ধ্বংসের যুগ আরম্ভ হইয়াছে। তাহাকে প্রতিরোধ করবার চেষ্টারত্রুটী পুঁজিপতিরা করে নাই; তথাকথিত গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী দেশগুলি একটির পর একটি ষড়যন্ত্র করিয়াছে পৃথিবীর সর্ব্ব প্রথম প্রকৃত জনরাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নকে ধ্বংস করিতে; আর তাহাদের প্রত্যেকের প্রচেষ্টাকে, প্রতিক্রিয়ার প্রতিটি আক্রমনকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে শোষিত শ্রেণীর গৌরব লাল ফৌজ। তাহার পর অভ্যুদয় হইল ফ্যাসিবাদের; ইঙ্গ মার্কিন নামে গণতন্ত্রীরা হিটলার মুসোলিনীর ঝঞ্ঝা বাহিনীকে অপরাজেয় তন্ত্রের জয়যাত্রার যুগ একথা ভালভাবে পরিস্কার হইয়া গিয়াছে। তাই না পুঁজিবাদী দেশগুলি আজ অর্থনৈতিক সংকটে ধুঁকিতেছে কোন দাওয়াই তাহাদিগকে উদ্ধার করতে পারিতেছে না। অন্যদিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও নয়াগণতান্ত্রিক দেশগুলি দ্রুতগতিতে আগাইয়া চলিয়াছে সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তির দিকে। উহারই ফল হিসাবে এই পৃথিবীতে দেখা দিয়াছে দুইটি শিবির, দুইটি জগৎ। একদিকে ইঙ্গমার্কিন ফ্যাসিবাদীরা সমস্ত কিছু অগ্রগতি ও প্রগতির পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে পুঁজিপতিদের কায়েমী স্বার্থকে বাঁচাইবার জন্য অন্যদিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে সারা বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি পৃথিবী হইতে শোষণ দূর করিয়া নূতন পৃথিবী গড়িয়া তুলিতে স্থিরনিশ্চিৎ একদিকে দুঃখ, দৈন্য, অভাব অনটন, বেকারত্ব, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু অন্যদিকে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, অগ্রগতি ও জীবনের পূর্ণ উপলব্ধি।

ফ্যাসিষ্টদের আবার যুদ্ধোদ্যম

সমাজতান্ত্রিক শিবিরের এই অগ্রগতি প্রতিক্রিয়াশীলদের ভীত করিয়া তুলিয়াছে; করিয়া গড়িয়া তুলিতে লাগিল, এতদিনে সাম্যবাদকে নিশ্চিহ্ন করার মত অস্ত্র মিলিয়াছে বলিয়া সোৎসাহে চিৎকার জুড়িয়া দিল, ফ্যাসিবাদকে আরও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হইল—আবিসিনিয়া আলবেনিয়া অষ্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ও মাঞ্চুরিয়া। দুর্দান্ত শক্তি লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল ফ্যাসিষ্ট বর্ব্বর সৈন্যবাহিনী সোভিয়েট ইউনিয়নের বুকে। কিন্তু তাহাদের এতদিনের অপরাজেয়তার গর্ব্ব সংঘবদ্ধ শ্রমিক কৃষকের প্রতিআক্রমনে চুরমার হইয়া গেল। সোভিয়েট রাষ্ট্রকে নিশ্চিহ্ন করিয়া সাম্যবাদকে খতম কয়িবার পরিবর্ত্তে ফ্যাসিবাদ ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় আরও ভাঙ্গন আনিয়া দিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়া মধ্য ইউরোপের নয়াগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির জন্ম; তাহারই ক্রম পরিণতি হিসাবে মহাচীনের বিপ্লব আজ সফলতার তীরবর্ত্তী, সারা বিশ্বের শোষিত মেহন্নতী প্রগতিবাদীরা আজ এক শিবির ভুক্ত। ইহা বিশ্ব পুঁজিবাদের মৃত্যুর পরোয়ানা জারী করিল। বিংশ শতাব্দী হইল মুমূর্ষু ধনতন্ত্রের মৃত্যুর যুগ, সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রার যুগ একথা ভালভাবে

তাহারা স্পষ্টই বুঝিতেছে জনতাকে ভুল বুঝাইয়া ঠাণ্ডা রাখা বেশী দিন যাইবে না, ক্রমে ক্রমে তাহারা বেশী করিয়া সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দিকে ঝুঁকিবে। ফলে বিশ্বপুঁজিবাদী শক্তি ক্রমশই দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। একদিকে পুঁজিবাদের সংকট কাটাইবার চেষ্টা অন্যদিকে শ্রমজীবী জনতাকে আসল অবস্থা জানিতে দিতে অনিচ্ছা সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিবাদীদের নূতন করিয়া এখনই আর একটি যুদ্ধ বাধাইবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করিয়াছে। বিশ্ব পুঁজিবাদ ভাল ভাবেই বোঝে যতদিন যাইবে ধনতন্ত্রের সংকট ততই তীব্ররূপ ধারণ করিবে, তাহার বিরুদ্ধ শক্তি ততই শক্তিশালী হইয়া হইবে; উপরন্তু এই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে শোষক ও শোষিতের মধ্যে, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের শক্তির মধ্যে শেষ শ্রেণী সংগ্রাম আন্তর্জাতিক আকারে রূপ লইতে যাইতেছে এবং ইহাতে-জয়পরাজয়ের উপরই ধনতন্ত্রের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে—এই কথাও তাহারা বোঝে। সুতরাং তাহারা উন্মাদের মত যুদ্ধ প্রস্তুতি গড়িয়া সোভিয়েট রাষ্ট্র ও তাহার মিত্র শক্তির চারিদিকে সামরিক ঘাঁটি গাড়িয়া ও একটির পর একটি সামরিক চুক্তি করিয়া চলিয়াছে। শুধু তাহাই নয় যত শীঘ্র এই যুদ্ধ বাধাইয়া দেওয়া যায় তাহার জন্য প্রচার ও প্রচেষ্টার অভাব নাই।

দেশে দেশে প্রতিক্রিয়াশীলরা ঐক্যবদ্ধ হইতেছে

এই সামরিক আঁতাতের প্রস্তুতি করিয়াই প্রতিক্রিয়াশীলরা নিশ্চিন্তে বসিয়া নাই। প্রত্যেক দেশে যত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আছে তাহাদিগকেও তাহারা একত্রিত করিয়া চলিয়াছে। তাই এখন শুধু সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলিই একতাবদ্ধ নয়, সঙ্গে সঙ্গে উপনিবেশগুলির পুঁজিপতি শ্রেণীর হাতে দেশ শাসনের রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিয়া তাহাদিগকেও টানিয়া আনা হইয়াছে পুঁজিবাদী ফ্যাসিবাদী শিবিরে। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলিলে বিশ্ব প্রতিক্রিয়া তাহার শক্তিকে চূড়ান্ত ভাবে সংগঠিত করিয়া চলিয়াছে নিশ্চিৎ ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচিবার আশায়। বর্ত্তমানের এই চূড়ান্ত শ্রেণী বিন্যাসের সময় পুঁজিপতি শ্রেণী পূর্বে যেমন গণতন্ত্রের মুখোসটি পরিয়া শোষণ চালাইত আজ সেই মুখোসটি রক্ষা করাও তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে; তাই এখন পুঁজিবাদীদের ফ্যাসিবাদী না হইয়া উপায় নাই। আর ফ্যাসিবাদের অর্থ শুধু নিছক

গণমোর্চা গঠন করিয়া প্রতিক্রিয়ার দুর্গ বিধ্বস্ত করুন

গায়ের জোরে শাসন নয়; কোন রকম সংস্কারের ধার ফ্যাসিবাদীরা মাড়ায় না—এ ধারণাও মারাত্মকভাবে ভুল। বরং সংস্কার তাহারা করিবেই করিবে তবে তাহা প্রগতির অগ্রগতির জন্য নয় প্রতিক্রিয়ার শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। তথাকথিত গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী দেশগুলিতে টিলেমী ও পুঁজিপতিদের নিজেদের মধ্যে স্বাধীন প্রতিযোগিতার নামে অরাজকতার জন্য যে অর্থনৈতিক সংকট বার বার দেখা দেয় যাহা জনতার বিপ্লবী সচেতনতা বৃদ্ধিই করে তাহাকে ফ্যাসিষ্টরা প্ল্যানিংএর মারফৎ আয়ত্বে আনিতে চায়। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইল প্রয়োজনবোধে ব্যক্তিগত পুঁজিপতিদের অবাধ প্রতিযোগিতার স্বাধীনতা কিছুটা কাটিয়া পুঁজিবাদকে তার দুর্বলতা হইতে মুক্ত করা, অন্যদিকে জনতার ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষকে চাপা দিবার উদ্দেশ্যে প্রথম অল্প কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়া তাহাদিগকে উগ্রজাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিপ্লবী আন্দোলন হইতে সরাইয়া আনা। একদিকে তাহাদের লক্ষ্য যত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আছে তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া বিপ্লব বিরোধী এমন কি বুর্জোয়াগণতন্ত্র বিরোধী শক্তিতে পরিণত করা, রাজনৈতিক অচেতন জনতার মধ্যে ফ্যাসিষ্ট সংঘশক্তির মাধ্যমে প্রচার চালাইয়া তাহাদিগকে প্রতিক্রিয়ার দুর্গে টানিয়া আনা এবং অন্যদিকে বিপ্লবী শক্তি সমূহকে চণ্ডনীতির আক্রমনে ধ্বংস করিয়া দেওয়া। প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশেই আজ তাহা হইতেছে। গণতন্ত্রী (?) মার্কিনমুল্লুকে সাম্যবাদ বিরোধী অভিযান চূড়ান্তরূপ লইয়াছে, শ্রমিকের ধর্মঘট বেআইনী ঘোষণা করা হইয়াছে, কু-ক্লাক্স-ক্লানের মত নগ্ন ফ্যাসিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে যথেচ্ছভাবে কাজ চালাইতে সুযোগ দেওয়া হইতেছে। ইংলণ্ডে ফ্যাসিষ্ট মোসলের সঙ্গে লেবার মন্ত্রীদের ঘনিষ্ঠতার কথা সর্বজনবিদিত, ফ্রান্সে দ্য গলের দলের প্রতি অকৃপণ সাহায্য, পশ্চিম জার্মাণী, অষ্ট্রিয়াও ইতালীতে পূর্বতন নাৎসী ও ফ্যাসিষ্ট সেনা নায়কদের পুনর্নিয়োগ করিয়া নূতন করিয়া ফ্যাসিষ্ট সংঘ শক্তি ও সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তোলা হইতেছে, স্পেনের জেনারেল ফ্রাঙ্কো আজ আর অপাঙক্তেয় নয়, জাপান ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ফ্যাসিষ্ট রাজত্ব কয়েম করা হইয়াছে, এখনও চীনের ব্যাপারে ফ্যাসিষ্ট চিয়াং ইঙ্গমার্কিণ পুঁজিবাদী দুনিয়ার কাছে চীনের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকৃত। ভারতবর্ষেও ইহার ব্যতিক্রম নাই। মার্শাল প্লিম আসিয়া ভারতবর্ষের রক্ষী ব্যবস্থা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন, আমেরিকার সামরিক মিশন কাশ্মীর পরিদর্শনে আসিতেছেন, আর, এস, এস, প্রভৃতি নগ্ন ফ্যাসিষ্ট সংগঠনকে আইনসঙ্গত করিয়া কংগ্রেসের মধ্যে গ্রহণ করা হইতেছে। এইভাবে বিশ্বপুঁজিবাদ তাহার সমগ্র শক্তি একত্রিত করিতেছে। অবশ্য একথাও ঠিক বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশ গুলির মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব আছে; তাহার প্রমাণ হইল পাউণ্ড ষ্টার্লিং মুদ্রামূল্য হ্রাস। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় এই পারস্পরিক দ্বন্দ্ব যে সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মধ্যে আর একটি বিশ্বযুদ্ধ বাধাইয়া দিবে তাহা নয়। মার্কিণের নেতৃত্বে সমগ্র পুঁজিবাদী শক্তি সোভিয়েট ইউনিয়ন ও নয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামের দিকেই দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে।

"The October Revolution has Created a powerful and open Centre of the world revolutionary movement, such as the world revolutionary movement never possessed before and around which it now can rally and organize a United revolutionary front of the proletarians and of the oppressed nations of all Countries against imperialism"—Stalin.

ফ্যাসিষ্টরা জনতার মধ্যে ফ্যাসিষ্ট সংঘ গড়িতেছে

ফ্যাসিবাদীরা পরিষ্কারভাবে জানে শুধু রাষ্ট্রশক্তির জোরে বিক্ষুব্ধ জনতাকে বিপ্লব হইতে দূরে সরাইয়া রাখা যায় না। তাহার উপর চিন্তাগত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার দরকার, তাহাকে ফ্যাসিষ্ট সংঘের অধীনে আনা দরকার। এই দ্বিমুখী আন্দোলন হিটলার মুসোলিনী করিতে ভুলে নাই। তাই একদিকে উগ্র জাতীয়তাবোধ, জাতীয় অতীত ঐতিহ্যের দোহাই দিয়া সমস্ত কিছু প্রগতিমূলক চিন্তা জাতীয় স্বার্থ বিরোধী বলিয়া প্রচার যেমন চলিতেছিল সমস্ত নাৎসী প্রচার যন্ত্র হইতে অন্যদিকে জনতার প্রতিটি অংশে ফ্যাসিষ্ট তেমনই সংগঠন গড়িয়া তুলিতে ভুলিয়া যায় নাই। এই ভাবেই জন্ম লয় নাৎসী শ্রমিক সংঘ, ফ্যাসিষ্ট ছাত্রসংঘ নাৎসী বেসরকারী সামরিক দল। হিটলার মুসোলিনীর উপযুক্ত বংশধর ট্রম্যান, এটলি, বেভিন, ব্লুম পাণ্ডিত জওহরলালের দল গুরুর নির্দ্দেশিত পথ ভালভাবে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। এই জন্যই ত ওয়ার্লড ট্রেডইউনিয়ন ফেডারেশনের বিরুদ্ধে ফ্যাসিষ্ট বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ গড়িয়া উঠিয়াছে; প্রতিটি দেশে জাতীয় ট্রেডইউনিয়নের দোহাই পাড়িয়া ফ্যাসিষ্ট শ্রমিক সংঘ গড়িয়া তোলা হইতেছে, যুবকদের যুদ্ধোন্মাদ করিয়া তুলিয়া যুদ্ধশিবিরে টানিয়া আনা হইতেছে এবং কি শ্রমিক, চাষী, মধ্যবিত্ত সর্ব্বত্রই সকল শ্রেণীর মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল সংঘ গড়িয়া তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চলিতেছে।

ভারতীয় রাষ্ট্র আবার অন্যান্য দেশগুলি হইতে আরও এক ধাপ আগাইয়া গিয়াছে। আই. এন, টি. ইউ. সি. শ্রমিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিষ্ট সংঘ; অধ্যাপক রঙ্গ প্রভৃতির কৃষক সভা কৃষকক্ষেত্রে তাই; এন, এস, ইউ ছাত্রদের মধ্যে ঐ একই কাজ করিবে। উপরন্তু ভারতবর্ষে ফ্যাসিবাদ জনতাকে ভালভাবে বাঁধিবার জন্য নীচু হইতে কেন্দ্রীভূত সংগঠন গড়িবার চেষ্টাও আরম্ভ করিয়াছে। ইহা হইল ভারতীয় রাষ্ট্রের গ্রামপঞ্চায়েতী ব্যবস্থা। যুক্তপ্রদেশে ইতিমধ্যে ফ্যাসিষ্ট পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা চালু হইয়াছে। উদ্দেশ্য গ্রামের সমগ্র জনসাধারণকে ফ্যাসিষ্ট সঙ্ঘ শক্তির অধীনে আনিয়া তাহাদিগকে প্রগতিবিরোধী শক্তিতে পরিণত করা।

পুঁজিবাদি বিরোধী সংগ্রামী গণমোর্চা কেবলমাত্র ইহাকে পরাস্ত করিতে পারে

ফ্যাসিষ্টদের এই অপচেষ্টাকে প্রতিহত করিয়া যুদ্ধকে পরাস্ত করিতে হইলে সংগঠিত করিতে হইবে গণশক্তিকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে জাত বিরাট গণশক্তি নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখিয়াছে যুদ্ধ তাহাদের ধ্বংস আনিয়া দিবে। তাই তাহারা যুদ্ধ চায় না আবার ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে তাহাদের কামানের খোরাক হইতে। কিন্তু তাহারা না চাহিলেই যে যুদ্ধ আসিবে না তাহা নয়। অধিকাংশ রাষ্ট্রই বর্ত্তমানে ধনিক শ্রেণীর দ্বারা শাসিত তাই তাহারা নিজ শ্রেণী স্বার্থের তাগিদেই জনতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের উপর আর একটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চাপাইয়া দিবে। তবে জনতা যদি

(২৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

গান্ধীবাদ ভারতবর্ষে পুঁজিবাদ-

লেখক—শিবদাস ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক, সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার

বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে ফ্যাসিজম ১৯১৯ সালে ইতালীতে সোস্যালডিমোক্র্যাটিক আন্দোলনের নেতা মুসোলিনীর নেতৃত্বে প্রথম সংগঠিত হয়। পরবর্ত্তীকালে অল্প সময়ের মধ্যেই, প্রত্যেকটি ধনতান্ত্রিক দেশেই ফ্যাসিষ্ট সংঘশক্তি গড়ে উঠতে থাকে। ফ্যাসিবাদের শ্রেণী চরিত্র, ও সামাজিক, অর্থনীতিক ও রাজনীতিক বৈশিষ্ট কি,—এই নিয়ে Epistemologyর ক্ষেত্রে বহু তর্ক-বিতর্কের অবসর থাকলেও দীর্ঘকালের জঘন্য ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা জনসাধারণের কাছে আজ ফ্যাসিবাদের সত্যিকারের রূপ তুলে ধরেছে। খুব স্পষ্ট ধারণা না থাকলেও ইউরোপে ফ্যাসিষ্টদের প্রথম অভ্যুদয়ের সময়ে মুক্তি কামী মানুষ মাত্রই বিশেষ করে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণী আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু ফ্যাসিবাদের ঠিক স্বরূপ ব্যাখা করতে এমন কি শ্রমিক শ্রেণীর সবচেয়ে অগ্রণী অংশ তাদের দলগুলি (কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি) পর্য্যন্ত সক্ষম হয়নি; তখন প্রত্যেকটি কমিউনিষ্ট পার্টী ফ্যাসিবাদের আদর্শগত ভিত্তি কোথায় এবং তার দর্শনই বা কি তা বুঝতে সক্ষম হয় নি অথবা বুঝে থাকলেও জনসাধারণের সামনে তাকে প্রচার করার এবং জনমনকে ফ্যাসিষ্ট সংস্কৃতির ছোঁয়াচ থেকে বাঁচাবার দায়িত্ব বোধ করেনি। তাই শুধুমাত্র সাংগঠনিক প্রতিরোধের ভিত্তিতে জনগণকে যান্ত্রিক শক্তি হিসাবে ব্যবহার করে ফ্যাসিবাদকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। এই ভাবে ফাঁকি দিয়ে রাজনীতি করতে যাওয়ার মাশুল কমিউনিষ্টদের পরবর্ত্তীকালে কড়ায় ক্রান্তিতে গুণে দিতে হয়েছে; এই কথার প্রমাণ মিলবে ইতিহাস থেকে—শক্তিশালী জার্ম্মাণ কমিউনিষ্ট পার্টীর অবলুপ্তি, ইটালীতে কমিউনিষ্ট পার্টীর নিশ্চিহ্ন হওয়ায়; স্পেনিস রিপাবলিকান দলের পতন ও স্পেনে ফ্যাসিজমের অভ্যুত্থান। সর্ব্বশেষে গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শোষিত জনসাধারণ বিশেষ করে কমিউনিষ্ট পার্টীগুলির অশেষ আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে জার্ম্মাণ, জাপান ও ইতালীর ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্র শক্তির সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন সত্ত্বেও দেখা গেল বড় বড় ধনতান্ত্রিক দেশগুলির (যাঁরা সবাই "Anti—Fascist Democratic Front" এর যোদ্ধা ছিলেন) সর্ব্বত্রই এমন কি এদের উপনিবেশ গুলির মধ্যেও ফ্যাসিবাদ নতুন কৌশলে নতুন রূপ নিয়ে দাঁনা বেঁধে উঠছে। যুদ্ধ বিজয়ের ঢক্কা নিনাদে জনসাধারণ ত দূরের কথা ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের champion বিভিন্ন দেশের Communist Party গুলি পর্য্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল—তারা বুঝতেই পারল না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যা ধ্বংস হয়েছে তা হচ্ছে আন্তর্জাতিক চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিষ্ট মতবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শুধুমাত্র জার্ম্মাণী, জাপান, ইতালীর ফ্যাসিষ্টদের রাষ্ট্র ও সামরিক শক্তি; ফ্যাসিবাদ তো ধ্বংস হয়ই নি বরং বিশ্বের ধনতান্ত্রিক দেশগুলির জনসাধারণ ফ্যাসিষ্ট সংস্কৃতির প্রভাবে বিশেষভাবে এখনও প্রভাবান্বিত; আর এই জন্যই গণতন্ত্রের মুখোস পরে ফ্যাসিবাদের নতুন করে দেশে দেশে "People's war"য়ে 'গণতন্ত্র ও জনগণের' জয়ের মধ্য দিয়েই সংগঠিত হওয়া সম্ভব হয়েছে। ইহাই Paradox of history। ফ্যাসিবাদ একটি আনকোরা সামাজিক phenomenon, শুধুমাত্র ইউরোপের রাজনৈতিক ঘাত প্রতিঘাত ও Social Democratic Partyগুলির বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়েই এই চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সংগঠিত হয়েছে, বিংশ শতাব্দীতে শুধুমাত্র ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক সঙ্কটই ধনতন্ত্রকে রক্ষা করার শেষ অস্ত্র হিসাবে ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রগুলির জন্ম দিয়েছে—এই ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হয়েই তখন বিশেষ কেহই এই সত্য বোঝবার চেষ্টা করেনি যে, কোন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনই দর্শন ও শ্রেণী সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন তো নয়ই উপরন্তু কোন না কোন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে বাধ্য। তাই শুধুমাত্র "Fascism is the naked dictatorship of capitalist class" এই টুকুর উপর ভিত্তি করেই ফ্যাসিবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমাজজীবনের মধ্যেই এর যা আদর্শগত ভিত্তি রয়েছে এবং কি বিশেষ ধরণের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সহায়তায় ফ্যাসিষ্টরা ধীরে ধীরে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে অর্থাৎ এক কথায় মতবাদের দিক থেকে এর Historical continuity কি তা' বুঝতে পারা বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির পক্ষে সম্ভব হয়নি। কাজেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যত তীব্র সংগ্রামই পরিচালনা করা হোক না কেন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আদর্শ গত সংগ্রামের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তাকে কার্য্যক্ষেত্রে অস্বীকার করার দরুণ উহা Partial ও one-sided attack against fascism হয়েছে। আমাদের এই কথা বুঝতে হলে গোড়াতেই কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত।

জনতার উপর যে শ্রেণীর নেতৃত্বই প্রতিষ্ঠিত থাক না কেন তার স্বরূপ পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধি করতে হলে কোন মার্কসবাদীর এক মুহূর্ত্ত ভুললে চলবে না যে নেতৃত্ব কথাটির প্রকৃত অর্থ, হয় ideological leadership নয় technical leadership অথবা দু'টাই একত্রে বুঝিয়ে থাকে, এবং Cultural revolution will proceed to technical revolution অর্থাৎ আদর্শগত নেতৃত্ব বিপ্লবী জনসাধারণের উপর যতক্ষণ না প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সফল বিপ্লব সংগঠিত করা বাস্তবে অসম্ভব। কারণ ".....to create a motive force for the accelaration of the process of uninterrupted revolution it is imperative for the working class Party (Communist Party) to win the masses over to its side and to isolate completely all forms of reactionary bourgeois ideologies from the main current of the revolutionary movement, failing which it will never come into existence"। এই সত্যকে অস্বীকার করে সফল বিপ্লবের কথা চিন্তা করা অবৈজ্ঞানিক। সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদের বিরুদ্ধে দ্বিধাহীন ভাবে আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়েই জনসাধারণ থেকে সর্ব্ব প্রকার বুর্জোয়া ও পেটী বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব। তবেই সাংগঠনিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে পঙ্গু করা সম্ভব ও জনসাধারণকে সর্ব্বপ্রকার সংস্কারবাদ ও উগ্র বামপন্থী মতবাদের মোহ থেকে মুক্তকরা সম্ভব। জনসাধারণকে রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন না করে শুধুমাত্র শ্লোগান ও tempoর উপরে ভিত্তি করে সাংগঠনিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে জনসাধারণকে বুর্জোয়া সংগঠনের প্রভাব থেকে মুক্ত করে শক্তিশালী বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলা বাস্তবে সম্ভব নয়। কারণ এইভাবে সংগঠন গড়ে তোলার জন্য তীব্র সংগ্রাম চালাবার ফলে হয়ত বা সাময়িকভাবে জনসাধারণের সাড়া পাওয়া যায় কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনার সময় এই অজ্ঞ ও যান্ত্রিক গণশক্তি (Unconscious ও Mechanical) mass force') বিপ্লবী দলের প্রধান শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে না এবং ক্রমে আস্তে আস্তে বিপ্লবী শিবির থেকে মূল জনশক্তি আলাদা হয়ে যায় এবং বিপ্লবী দল জনশক্তির সমর্থন হারিয়ে ফেলে। তখন হয় সে দল অস্তিত্ব রক্ষা করবার জন্য সংস্কারবাদের পথে এগুতে থাকে নয়ত উগ্র বামপন্থীর নীতি অবলম্বন করে নিজেকে দ্রুত ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলোর ইতিহাস আলোচনা করলে এই ধরণের দৃষ্টান্তের অভাব হবে না। ফ্যাসিবাদের সঠিক রূপ জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে না পারার জন্যই নাৎসীরা যখন হিটলারের নেতৃত্বে জার্ম্মাণীতে ক্ষমতা দখল করল তখন ফ্যাসিবিরোধী জার্ম্মাণ জনসাধারণ তাকে চিনতে ভুল করল। ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের দুর্ব্বলতার এই সুযোগ হিটলার ভালভাবেই কাজে লাগিয়েছেন। ফ্যাসিষ্টরা বর্বর, জনসাধারণকে ঠেঙানোই তাদের কাজ—এই ধরণের ধারণা জনসাধারণের মধ্যে সৃষ্টি করার জন্যই হিটলার —ফ্যাসিবাদের দ্বৈত নীতির অপকৌশলে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করেন।

একদিকে National Socialismএর প্রচার ও দেশের জনসাধারণের প্রতি Social Democratic মনোভাব ও প্রচলিত বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদনের অরাজকতা, সাময়িকভাবে কিছুটা অংশে Concentration of state capitalism এর নীতি প্রবর্ত্তন করে ফ্যাসিষ্ট planning এর মারফৎ জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হওয়া এবং সেই সুযোগে কমিউনিষ্ট পার্টি এবং তার বিপ্লবী জনগণের সংগঠনগুলির উপর বর্বর আক্রমণ চালিয়ে দেশের বিপ্লবী আন্দোলনকে সমূলে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছিল ফ্যাসিষ্টরা। জার্ম্মাণীর কমিউনিষ্ট পার্টির এই শোচনীয় পরিণতির পরেও ফ্যাসিবাদের দর্শন ও ফ্যাসিষ্ট সংস্কৃতির মূল স্বরূপ কি তা' বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলো বুঝতে সক্ষম হয়নি এবং তারই

ফ্যাসিবাদের আদর্শগত ভিত্তি

SOC... INDIA
48, Dh... 13.

অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে প্রত্যেক দেশেরই ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক যুদ্ধ-শিবিরে জার্ম্মাণ, জাপান, ইটালী অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের চাম্পিয়ান হিসাবে ফ্যাসিষ্টরাও যুদ্ধজয়ের জন্য লড়েছিল। ফ্যাসি-বিরোধী ফ্রণ্টে theory এবং practice-এর মধ্যে সবচেয়ে বড় রকমের অসামঞ্জস্য এখানে। তাই প্রত্যেকটি বিপ্লবী, গণতান্ত্রিক ও সৎব্যক্তি মাত্রের কাছেই আমরা পরিষ্কার ভাবে এই কথা পৌঁছে দিতে চাই যে আন্দোলনের ক্ষেত্রে ফ্যাসিষ্ট হিসাবে যাদের আপনারা রুখতে চান, দেশের জাতীয় সাংস্কৃতিক জীবনেও তাদের প্রভাবকে এক কথায় ফ্যাসিবাদের দর্শন-গত ভিত্তি ও তার সংস্কৃতিকে যদি জন-সাধারণের সমক্ষে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে সক্ষম না হন তা'হলে কোন একটি বিশেষ ফ্যাসিষ্ট সংঘশক্তিকে ধ্বংস করতে সক্ষম হলেও ফ্যাসিবাদকে সমূলে ধ্বংস করা সম্ভব হবে না এবং সেক্ষেত্রে আবার নূতন ফ্যাসিষ্ট সংঘশক্তি গড়ে উঠবে এবং এই পথে বার বার প্রতিক্রিয়ার জয়কে সম্ভব করে তোলা হবে।

ভারতবর্ষে আজ ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রশক্তি কায়েম হয়েছে এবং ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি জনসাধারণই আজ জাতীয় সরকারের ফ্যাসিষ্ট স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে। কংগ্রেসী ফ্যাসিষ্টদের প্রতি জনসাধারণের মনে বিন্দুমাত্র মোহ অবশিষ্ট না থাকলেও ভারতীয় ফ্যাসিবাদের সংস্কৃতিগত ভিত্তি গান্ধীবাদ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধরণের দর্শন ও আধ্যাত্মিক মতবাদের ভিতর নিহিত হয়েছে, সেই সব ফ্যাসিষ্ট সং-স্কৃতির স্বরূপ আজও জনসাধারণের কাছে ধরা পড়েনি। যতদিন পর্য্যন্ত না গান্ধীজীর শ্রেণী সমন্বয় ও অহিংসা মতবাদের স্বরূপ জনসাধারণ পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে পারছে এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে বিভিন্নভাবে যত রকমের অতিপ্রাকৃত (Supernatural) ভাবধারা মিশে রয়েছে তার থেকে বিপ্লবী জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনকে প্রভাবমুক্ত করা না যাচ্ছে ততদিন পর্য্যন্ত ফ্যাসিষ্ট সংঘশক্তিকে ধ্বংস করা বাস্তবে সম্ভবপর নয়। এর জন্য প্রয়োজন সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে তীব্র আদর্শ-গত সংগ্রাম পরিচালনা করা এবং সাথে সাথে দ্রুতগতিতে জনগণের বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলা। এর কোনটিকে বাদ দিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলে প্রকারন্তরে ফ্যাসিষ্টদেরই সাহায্য করা হবে। তাই গান্ধীবাদ কি এবং ভারতবর্ষের ফ্যাসিষ্ট সংস্কৃতির ব্যাপক রূপ কি জনসাধারণকে সে সম্বন্ধে আজ আর অজ্ঞ থাকলে চলবে না। গান্ধীবাদের মানবতার মুখোস ছিঁড়ে ফেলে তার ফ্যাসিষ্টরূপ জনসাধারণকে চিনিয়ে দেওয়াই প্রগতি শীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রধান কর্ত্তব্য। "Gandhism is a sublimatic transformation of bourgeois class instinct originated through the process of synthesis of the senses of bourgeois moral values and anti-working class fear-complex of revolution of Gandhi".

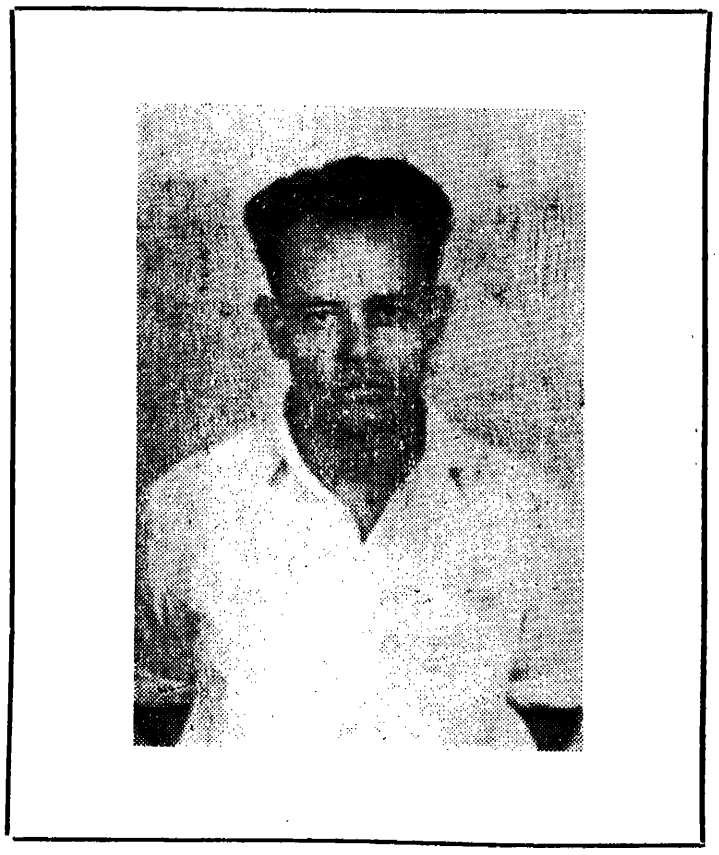

শ্রেণী বিভক্ত সমাজের প্রত্যেকটি মানুষই (কোন না কোন শ্রেণীর সাথে) প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কোন না কোন শ্রেণী স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে। শ্রেণী নিরপেক্ষ চরিত্র ও মনোভাবের কথা চিন্তা করা অবাস্তব এবং নিছক কল্পনাই নয় উপরন্তু শোষিত জন সাধারণ-কে বিভ্রান্ত করার ও বিপথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে তাদের সামনে অতি প্রাকৃত শক্তি সম্পন্ন শ্রেণী স্বার্থের উর্দ্ধে অবস্থিত অতিমানবের (Super man) আদর্শ স্থাপনা করার অপকৌশলও বটে। এই ভাবে শোষক শ্রেণী প্রায় প্রত্যেক দেশেই এক একটি আতি মানবকে খাড়া করে জনসাধারণের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করার অপচেষ্টা করে চলেছে। সবচেয়ে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে এই সমস্ত মহা-মানব বা Prophet দের মধ্যে অনেকেই স্বেচ্ছায় সমস্ত রকম ত্যাগ স্বীকার করে জনসাধারণের সাথে এমনভাবে নিজেদের এক করে ফেলার চেষ্টা করেন যে আপাত দৃষ্টিতে স্বভাবতই মনে হয়: এরাই বুঝি জনসাধারণের মুক্তি আন্দোলনের সত্যি কারের পথ প্রদর্শক। কারণ এদের বাস্তব কর্ম্মজীবন ও চিন্তাধারার মধ্যে এদের শ্রেণী চরিত্র এমন প্রচ্ছন্ন ভাবে লুক্কায়িত থাকে যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ব্যতীত সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা এমন কি তারা নিজেরাও অনেক ক্ষেত্রে তাদের অবচেতন স্তরে লুক্কায়িত আসল রূপ বা শ্রেণী চরিত্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকে না। সাধারণত জনসাধারণ মনে করে যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তি স্বার্থের উর্দ্ধে যেতে সক্ষম হয়েছে সেই তাদের মুক্তি আন্দোলনের নেতা হবার যোগ্য ব্যক্তি। অতিমানবতাবাদের জন্যই এই ধরণের সাধারণ বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। একমাত্র দ্বান্দিক বস্তুবাদের বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও সমাজ বিজ্ঞানের সহায়তায় এই কথা বোঝা সম্ভব যে ব্যক্তির মানসিক কাঠামো তার শ্রেণী চরিত্রের Super structure মাত্র অর্থাৎ চলতি উৎপাদন ব্যবস্থার সংগে ব্যক্তি মাত্রেরই যে সম্বন্ধ রয়ে গেছে তারই উপর ভিত্তি করে ব্যক্তির মানসিক কাঠামো এক কথায় তার ব্যক্তি চরিত্র গড়ে উঠেছে। কাজেই এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বার্থত্যাগই বড় কথা নয় তার শ্রেণী চরিত্র ও শ্রেণী স্বার্থ কি তার সঠিক বিশ্লেষণই বড় কথা। এবং যেহেতু কোন কর্ম্মই উদ্দেশ্য বিহীন নয় সেই হেতু কার্য্যকারণের নীতির নিয়ম অনুসারে ব্যক্তির স্বার্থত্যাগেরও কারণ রয়েছে। আর সে কারণ বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে এর পিছনে কোন শ্রেণী স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। অবশ্য এ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সব সময় সেই ব্যক্তি সচেতন নাও থাকতে পারে। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় শোষিত জনসাধারণের সবচেয়ে বড় শত্রু এই সমস্ত সাধু মহাত্মার দল ও তাঁদের বহুরূপী মানবতা-বাদ। কারণ সোজা সরলরেখায় প্রতি-নিয়ত শোষক শ্রেণীর কাছ থেকে যে অত্যাচার জনসাধারণের উপর নেমে আসে ও যে দল বা মতবাদ সোজাসুজি বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থাকে সমর্থন করে তার স্বরূপ জনসাধারণ সহজেই চিনে নিতে পারে। কিন্তু মানবতাবাদ বা এই ধরণের আধ্যাত্মিক মতবাদের পেছনে যে বুর্জোয়া শ্রেণী স্বার্থ প্রচ্ছন্ন থাকে জনসাধারনের পক্ষে তা'র স্বরূপ চিনে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। আমাদের দেশে গান্ধীবাদ ও এই একই ধরণের সমস্যার সৃষ্টি করেছে। গান্ধীজীর ব্যক্তিগত জীবনের বহুবিধ ত্যাগ ও রোমাঞ্চকর ঘটনার আড়ালে গান্ধীবাদের প্রধান শ্রেণী চরিত্র (dominant class-character) মুষ্টি মেয় কয়েক জন মার্ক্সবাদী ব্যতীত গোটা দেশের জনসাধারণের নিকট অজ্ঞাত রয়ে গেছে। কারণ গান্ধীজীর চিন্তাধারা যে সমস্ত বুর্জোয়া superstition থেকে উদ্ভূত, সে সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা না থাকার জন্যই গান্ধীজীর তথাকথিত মানবতার আদর্শে জনসাধারণ এত সহজে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। গোঁড়ামি ও অন্ধতা জনিত যে আত্মপ্রতায় ও অন্তরাশ্রয়ী চিন্তাধারা, গান্ধীবাদের দার্শনিক ভিত্তি রচনা করেছে যত কঠিন কাজই হোক জনসাধারণকে সে সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে না পারলে গান্ধীবাদের প্রভাব হতে জনসাধারণকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। গান্ধীজীর অতিপ্রাকৃত ঐশ্বরিক শক্তির ধারণা, অবৈজ্ঞানিক ও চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তারই পরিচায়ক। বিংশ শতাব্দীতে বাস করেও কতখানি অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন হলে প্রকাশ্যে নির্লজ্জ ভাবে এই কথা বলা যায় যে "Thinking is the contemplation of God" ফ্যাসিষ্ট দার্শনিক Gentile এই কুখ্যাত মতের প্রচারক। Gentile এর এই nonsense expression গান্ধীর দর্শনের প্রাণকেন্দ্র। গান্ধীজীর অহিংস-বাদ ও শ্রেণী সমন্বয় নীতির অযৌক্তিকতা

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

অন্যান্য বিপ্লবের সঙ্গে অক্টোবর বিপ্লবের পার্থক্য কোথায় ?

লেখক—জ্যাকব উশেরেংকো

জোসেফ স্তালিন বলছেন :— ধনিকদের তাড়ান জমিদারদের তাড়ান ……ক্ষমতা দখল করা, স্বাধীনতা পাওয়া এগুলো তো নিশ্চয়ই ভাল কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্বাধীনতাটুকুই সব নয়। খাদ্যের যদি অভাব থাকে, মাখন আর চর্বির যদি অভাব থাকে, কাপড় যদি না থাকে, থাকবার ব্যবস্থা যদি ভাল না হয় তাহলে শুধু স্বাধীনতায় কতটুকু ফল ?"

মানুষের ইতিহাসে বিপ্লব ঘটেছে একবার নয় অনেকবার। সামাজিক আর অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা যতবার বদলেছে বিপ্লবের মধ্যে দিয়েই বদলেছে। কিন্তু দাস ব্যবস্থার জায়গায় সামন্ততন্ত্র আসুক বা সামন্ততন্ত্রের জায়গায় ধনতন্ত্র আসুক সাধারণ মানুষের জীবনে তেমন কোন মৌলিক অদল বদল হয়নি। সমাজে মুষ্টিমেয় শোষক শ্রেণী অগনিত মানুষকে শোষণ করে চলেছে বরাবর। হয়েছে কেবল শোষক বদল।

একমাত্র অক্টোবর সমাজতন্ত্রী বিপ্লবই মানুষকে এমন এক নতুন যুগে এনে হাজির করেছে যেখানে শ্রেণীবিভেদ হীন সাম্যবাদী সমাজ গড়া সম্ভব। সে বিপ্লব পুঁজিবাদের শিকল ছিঁড়েই থেমে যায় নি, কোটি কোটি মানুষকে সুখের জীবন গড়ার উপযোগী ভিত্তি গড়ে দিয়েছে। এইখানেই হল সে বিপ্লবের অপরাজেয় শক্তির উৎস।

অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্যে সোবিয়েৎ ইউনিয়নে শোষক শ্রেণী নিঃশেষে মুছে গিয়েছে। বেকার সমস্যা না থাকায় অর্থাৎ দারিদ্র্য না থাকায়, শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা বেড়ে চলায়, শ্রমিক এবং যৌথ চাষীর পণ্য উৎপাদন ক্ষমতা দিনে দিনে বেড়ে চলায়, বিজ্ঞান এবং কারুবিদ্যার অপূর্ব্ব প্রগতির ফলে মেহনতী জনসাধারণের জীবনে সচ্ছলতা আসার সুবর্ণ সুযোগ দেখা দিয়েছে। জাতীয় আয় বৃদ্ধিই হোল তার প্রমাণ। ১৯১৩ সালে যে ক্ষেত্রে জাতীয় আয় ছিল ২১০০ কোটি রুবল, ১৯৩৮ সালে তা দাঁড়াল ১০৫০০ কোটি রুবল অর্থাৎ ৫ গুণ। ১৯৪০ সালে ৫ গুণের জায়গায় ৬ গুণ হোল জাতীয়আয়। যুদ্ধোত্তর ৫-সালা পরিকল্পনার আমলে জাতীয় আয় দাঁড়াবে ১৯২৬-২৭ সালের নির্দিষ্ট মূল্যে ১৭৭০০ কোটি রুবল।

বিপ্লবের আগেকার রুশিয়ায় শতকরা ৮৪.১ জন ছিল শ্রমিক কিন্তু তাদের ভাগ্যে জুটত জাতীয় আয়ের মাত্র সিকি ভাগ। বাকী তিন সিকি হাতিয়ে নিত ধনিক জমিদার জোতদার (কুলাক) বণিক কালবাজারীরা। অথচ তারা ছিল মাত্র শতকরা ১৫.৯ জন।

সোবিয়েতে জাতীয় আয়ের একটি পয়সাও শোষক শ্রেণীর হাতে যেতে পারে না কারণ শোষক শ্রেণীর অস্তিত্ব সমাজতন্ত্রে থাকতে পারে না। সমস্ত জাতীয় আয় জনগণের স্বার্থে খরচ করা হয়ে থাকে।

আমেরিকা ও বৃটেনে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষক শ্রেণী জাতীয় আয়ের শতকরা ৪০ ভাগ পেয়ে থাকে। ব্রিটিশ "সমাজতন্ত্রী" সরকারের "সমাজতন্ত্রী" অর্থনীতির এর চেয়ে আর ভাল পরিচয়ের বোধ হয় প্রয়োজন নেই। এই ধরণের "সমাজতন্ত্র" থাকলে ধনিক শ্রেণীর সুবিধা হয় বৈকী।

১৯২৮ সালে সোবিয়েতে শ্রমিক ও কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ১০,৮০০,০০০, ১৯৪০ সালে দাঁড়ায় ৩১,২০০,০০০ অর্থাৎ তিন গুণ। সোবিয়েতে বেকার সমস্যার কোন অস্তিত্বই নেই।

ধনিক সমাজের রাজনীতিবিৎ এবং সমাজনীতিকেরা বার বার প্রত্যেকের কাজ পাবার অধিকারের কথা ঘোষণা করেছেন। এই নিয়ে বুর্জোয়া পার্টিগুলো কতই না সনদ, কত ইস্তাহার কত ঘোষণা-পত্র লিখে দিস্তে দিস্তে কাগজ খরচ করেছে। কিন্তু সেগুলো সবই কাগজে কলমেই রয়ে গিয়েছে। ধনিকেরা তো বেকার সমস্যার সমাধান চাইতেই পারে না। বেকার সমস্যা বাদ দিয়ে বেকার "রিজার্ভ আর্মি" না থাকলে ধনিকতন্ত্র বেঁচে থাকে কি করে ? বেকার সমস্যা তো ধনতন্ত্রেরই বরপুত্র।

সমাজতন্ত্রের দেশে ব্যাপারই অন্যরকম। সেখানে কিষাণ মজুরের হাতে ক্ষমতা, সমাজতন্ত্রী মালিকানায় সেখানে সামাজিক উৎপাদন হয়। শোষক শ্রেণীর অস্তিত্ব নেই সেখানে। অর্থনীতি জনগণের স্বার্থের অনুকূলে এগিয়ে চলে। একমাত্র সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থাতেই বেকার সমস্যার মূল পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকে উপড়ে ফেলা সম্ভব। সোবিয়েতে প্রত্যেকে নিজের সামর্থ্য ও পছন্দমত কাজ বেছে নিতে পারে। বেকারের দলভর্ত্তি পুজিবাদী সমাজের এক মুখপত্র মার্কিন "Banker's Journal" বলছে প্রত্যেকের কাজ পাবার অধিকার আছে এটা আধুনিক যুগের একটি অসম্ভব কথা।

সোবিয়েতের প্রত্যেক শ্রমিক আর চাষী জানে যে দেশের যত সম্পদ বাড়বে তার নিজের পরিশ্রমের কল্যাণে, তার নিজেরও সচ্ছলতা তত বাড়বে। ১৯২৮ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে সোবিয়েতে শ্রমিক ও কর্মচারীদের গড় বাৎসরিক বেতন প্রায় ৬ গুণ বেড়েছে। ১৯২৮ সালে শ্রমিক ও কর্মচারীদের বেতন বাবদ খরচ হয় ৮২০ কোটি রুবল, ১৯৪০ সালে হয় ১৬২০০ কোটি অর্থাৎ ২০ গুণ।

শ্রমিক ও কর্মচারীর আসল বেতন সোবিয়েতে ১৯২৯ সালেই ১৯১৩ সালের তুলনায় বাড়ে শতকরা ৬৭ ভাগ দ্বিতীয় ৫—সালা সংকল্পের সময় আসল বেতন তার দ্বিগুণ হয়। যুদ্ধোত্তর কালে আরো বেড়ে চলেছে। বরাদ্দ ব্যবস্থা তুলে দেওয়া এবং পণ্যের দর বার বার কমাবার ফলে আসল বেতন অনেক বেড়ে গিয়েছে।

যৌথ কৃষি ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যকে একেবারে মুছে ফেলেছে। বিপ্লবের আগেকার তুলনায় যৌথ চাষীদের হেপাজতে আজ সাড়ে তিনগুণ জমি। ১৯৩২ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে চাষীদের নগদ আয় বেড়েছে সাড়ে ৪ গুণ। যুদ্ধের আগে যৌথ খামারের রিজার্ভ তহবিলে ২১০০ কোটি রুবল জমা হয়। ১৯১৪ সালে রুশিয়ার চাষীরা শস্য ইত্যাদি বেচে মোট আয় করে ১৮০ কোটি রুবল, ১৯৩৭ সালে যৌথ চাষীরা আয় করে মোট ৩০০০ কোটি রুবল (অর্থাৎ ১৭ গুণ)। যুদ্ধে এত ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও তাদের আয় আরো বেড়ে চলেছে।

এঙ্গেলস তাঁর "Anti Duhring" বই খানিতে লিখছেন যে শোষণ মূলক সমাজে জনসাধারণকে অপর্যাপ্ত পণ্য দেওয়াই নিয়ম। তাই শ্রমিক শ্রেণীর ভাগে পণ্যের সামান্যই পড়ে, অধিকাংশটাই যায় শাসক শ্রেণীর পেটে। লেনিন লিখেছেন :— "উৎপাদনে এবং ব্যবহারের মধ্যে পুজিবাদে যে বিরোধ রয়েছে তার ফলে এক দিকে যেমন জাতীয় সম্পদ বেড়ে চলে তেমনি আর একদিকে জনসাধারণের দারিদ্র্যও চলে বেড়ে।"

আজকের দিনে ধনতন্ত্রের বর্ত্তমান সংকটের যুগে লেনিনের বিশ্লেষণ আমাদের চোখের সামনে ভাসছে। এর জন্য বেশী দূর যেতে হবে না। বৃটেন ও ধনিক রাজ্যের অন্যান্য দেশে আজ যে মুদ্রার মূল্য কমান হল তার ফলে মেহনতী জনগণকে আরো দুঃস্থ করে শাসক শ্রেণী আরো মুনাফা ঘরে তুলবে।

অক্টোবর বিপ্লব ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত উৎপাদন ও ব্যবহারের মধ্যে বিরোধকে মিটিয়ে দিয়েছে। সোবিয়েতে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পণ্য ব্যবহার বাড়ে। সোবিয়েত বাসীর সামনে ঐ যে আজ কমুনিষ্ট সমাজের উচ্চশিখর।

—টাস

গান্ধীবাদ ভারতীয় ফ্যাসিবাদের ভিত্তি

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)

"theory of belief" এর দোহাই পেড়ে চাপা দেওয়া হয়েছে। আর এই "theory of belief" এর গোড়ার কথা হচ্ছে "thinking is the contemplation of God." গান্ধীজীর মতে অহিংসা ও শ্রেণী সমন্বয়ের মতবাদ বৈজ্ঞানিক কি অবৈজ্ঞানিক সেটা আলোচনার বাইরে এবং ইহা যেহেতু morality (?) সম্মত (যা আসলে বুর্জোয়া sense of Moral value ছাড়া আর কিছুই নয়) সেই হেতু এই পথই সমাজের অগ্রগতির একমাত্র পথ কারণ গান্ধীজীর মতে morality অপরিবর্ত্তনীয় শাশ্বত। গান্ধীজী কোন প্রমাণের উপর নির্ভর না করেই ধরে নিয়েছেন মানুষ originally good আর এই goodnessই অবিনশ্বর ও শাশ্বত সত্য। এইভাবে formal logic এর পথ ধরে গান্ধীজী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁর enunciated moral principle মানুষের সেই essential goodness এরই সামগ্রিক ও সম্পূর্ণ প্রকাশ ; এবং এই জন্যই গান্ধীজী শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শ্রেণী সংগ্রামের ঐতিহাসিক আবশ্যকতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন নি। antagonistic social force বলতে গান্ধীজী সমাজের দুইটি পরস্পর বিরোধী শ্রেণীর ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হন নি। সুনীতি বনাম দুর্নীতির দ্বন্দ্বকে গান্ধীজী সমাজের ভিতর মূল পরস্পর বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ বলে ধরে নিয়েছেন। আসলে সেগুলো হচ্ছে Capital ও labour এর পরস্পর বিরোধী রূপ ও সংঘর্ষের super structure মাত্র ; অর্থাৎ ঈর্ষা, লোভ প্রভৃতি যে সমস্ত কুমনোবৃত্তিগুলিকে সমস্ত রকমের ব্যভিচার অত্যাচার ও শোষণের মূল বলে গান্ধীজী ভাবছেন আসলে সেগুলোই হচ্ছে "by-product of the Capitalist system", গান্ধীজীর এই সমস্ত ভুল ধারণার মূল নিহিত রয়েছে পূর্ব্ব কথিত "bourgeois superstition," "theory of belief" ও "Thinking is the contemplation of God"—এই সমস্ত অদ্ভুত ও অতিপ্রাকৃত মতবাদের মধ্যে।

আলবার্ট এণ্ড ডেভীড কোম্পানীতে ধর্মঘট

ধর্মঘটীদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ

গত ১২ই নভেম্বর হইতে অ্যালবার্ট এণ্ড ডেভীড কোম্পানীতে ধর্মঘট শুরু হইয়াছে। হেড অফিস (আর্য্যস্থান বিল্ডিং), দমদম ও তালতলা এই তিনটি জায়গাতেই পূর্ণ ধর্মঘট চলিতেছে। ২।১ জন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা ছাড়া আর কেহই কাজে যোগ দেন নাই। ধর্মঘটের কারণ হইতেছে যে এই অফিসে চিরাচরিত বাৎসরিক মাহিনা বৃদ্ধি (yearly increment) এবার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ এই অফিসে মাগ্‌গী ভাতা মাত্র ১৯৲ টাকা দেওয়া হয় যাহা যে কোন অফিসের তুলনায় অনেক কম। তৃতীয়তঃ ইউনিয়নের নিয়মকে লঙ্ঘন করিয়া ইউনিয়নের সাথে আলাপ না করিয়া স্থায়ী লোকদের চাকুরী হইতে খয়খাস্ত করা হইতেছে। চতুর্থতঃ কর্মীদের সর্বপ্রকার ধার এবং আগাম টাকা (Loan and advance) দেওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ধরণের কার্য্য কলাপের বিরুদ্ধে মোট ৩২টি দাবী ইউনিয়ন হইতে মালিকের কাছে বহুদিন আগেই জানানো হইয়াছে কিন্তু কোন প্রকার সুরাহা না হওয়াতে তাহারা ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

সবচেয়ে আশ্চর্য্য ঘটনা হইতেছে যে গত ১২ই নভেম্বর শনিবার যখন শান্তি পূর্ণ ভাবে ধর্মঘট চলিতেছিল তখন হেড অফিসে পুলিশ বিনা কারণে ধর্মঘটী কর্মীদের ভীষণ ভাবে প্রহার করে ও লাঠি চার্জ করে। কিন্তু ইহা সত্বেও ধর্মঘটীগণ শান্তিপূর্ণ ছিলেন। এই ঘটনাকে দৈনিক ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকা বিকৃত ভাবে প্রচার করিয়াছে। তাহারা লিখিয়াছে যে ধর্মঘট বৃহস্পতিবার হইতে চলিতেছে এবং ধর্মঘটের সময় কর্মীরা গণ্ডগোল সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু আমরা জানি যে ধর্মঘট শনিবার আরম্ভ হইয়াছে এবং দ্বিতীয় কথাও সর্বতভাবে মিথ্যা। ইউনিয়নের বাহিরের ও ভিতরের সংস্কারবাদী ও দালাল তথাকথিত শ্রমিক নেতাদের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ধর্মঘট যাহাতে বানচাল হইয়া না যায়, সেই সম্বন্ধে শ্রমিকরা পূর্ণ সচেতন রহিয়াছে।

পশ্চিম বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রতীক ধর্মঘট

ছাত্র ও শিক্ষকের সংগ্রামী ঐক্য প্রতিক্রিয়াকে রুখবেই রুখবে

পশ্চিম বাঙ্গলার মাধ্যমিক শিক্ষকগণ পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে ১৫ই ও ১৬ই নভেম্বর প্রতীক ধর্মঘট পালন করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মূল দাবী ন্যূনতম মূল বেতন ১০০৲ টাকা ও আগামী ভাতা ৩০৲ টাকা। এই সামান্য দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে এই দুবছর ধরেই বহু আবেদন করে এসেছেন সরকারের কাছে। কিন্তু সুফল ফলবার কোন আশা না দেখে তাঁরা নিতান্ত উপায়হীন হয়ে প্রতীক ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এই ধর্মঘটকে সাফল্য মণ্ডিত করবার জন্য সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার ছাত্র ব্যুরো, প্রগ্রেসিভ ষ্টুডেণ্টস ব্লক, ছাত্র কংগ্রেস প্রভৃতি বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছেন। এই ধর্মঘট সম্পর্কে পূর্বপরিচিত কিছু দালাল শিক্ষক বিভ্রান্তি ঘটাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু বিপ্লবী ছাত্র ও সংগ্রামশীল শিক্ষক ঐক্য সকল রকম বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে তাঁদের দাবীকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য এগিয়ে এসেছেন। এই ঐক্য এমন শিক্ষকদের দাবী না মিটলে ফেব্রুয়ারী মাসে অবিরাম ধর্মঘটকে জয়-যুক্ত করবার উপযুক্ত পথ খুলে দেবে নিশ্চয়।

নভেম্বর বিপ্লব দিবস প্রতিপালিত

নয়া-দিল্লীর সোভিয়েট দূতাবাসে প্রীতি-অনুষ্ঠান

গণদাবীর প্রধান সম্পাদক ও পরিচালকের যোগদান

গত ৭ই নভেম্বর, সোমবার, নয়া-দিল্লীর সোভিয়েট দূতাবাসে নভেম্বর বিপ্লব দিবস সাড়ম্বরে প্রতিপালিত হয়। সমগ্র দূতাবাস ও তৎসংলগ্ন ময়দানটি বিভিন্ন বর্ণের আলোক মালায় সজ্জিত হইয়া এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত কমরেড নভিকভ ও দূতাবাসের অন্যান্য কর্মচারীরা অতিথি-দিগকে সাদরে গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রায় এক সহস্র ব্যক্তি যোগদান করেন।

সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতের প্রাইভেট সেক্রেটারী কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া গণ-দাবীর প্রধান সম্পাদক কমরেড সুবোধ বান্যার্জী উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। তাঁহার সহিত গণদাবীর পরিচালক কমরেড রথীন সেনও উপস্থিত ছিলেন।

সান্ধ্য অনুষ্ঠানের পূর্বে কমরেড ব্যানার্জি ও কমরেড সেনের সহিতে সোভি-য়েটের দিল্লীস্থ টাস নিউস এজেন্সির প্রতি-নিধির দীর্ঘ আলাপ আলোচনা হয়। আন্তর্জাতিক ও ভারতীয় পরিস্থিতি, সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি এবং টাসের সংবাদ পরি-বেষণ প্রভৃতি বিষয়ের উপর প্রধানত আলোচনা চলে।

ছাত্র আন্দোলনের লক্ষ্য

(১৭ পৃষ্ঠার পর)

সংগ্রামী সংগঠন। সেই সংগঠনই ছাত্রদের গড়ে তুলতে হবে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এত ছাত্র-সংগঠন থাকতে আবার সংগঠনের কথা কেন? যদি আমরা দলীয় গোঁড়ামীর ওপরে উঠে দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি ভাল করে বিবেচনা করি, যদি বিপ্লবের স্বার্থের খাতিরে দলীয় এক গুয়েমী ত্যাগ করে দেখি তাহলে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনগুলির কোনটিরই একক ভাবে কংগ্রেসী জয়-প্রকাশী, ফ্যাসিষ্ট, নিও-ফ্যাসিষ্টদের অভিযানকে রোধ করার শক্তি নেই। অথচ তা না পারলে ভারতবর্ষের ভবিষ্যত অন্ধকারময়। সমস্ত ছাত্র প্রতিষ্ঠান-গুলিকে রাতারাতি ভেঙ্গে দিয়ে একটা সত্যিকারের সংগ্রামী ছাত্র প্রতিষ্ঠান গড়ার কথা চিন্তা করা বর্ত্তমান বাস্তব অবস্থায় দিবা স্বপ্ন দেখারই সামিল। তাহলে ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে ফ্যাসিষ্ট আক্রমনকে চূর্ণ করতে হলে বিপ্লবে বিশ্বাসী এমন বিভিন্ন ছাত্র শক্তিকে তাদের মধ্যে বৃহত্তম সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে এক মোর্চায় একত্রিত করতে হবে। এই মোর্চাগঠণ কাজে যেমন সমস্ত রকমের দলীয় গোঁড়ামী ও একগুয়েমীকে পরিহার করতে হবে তেমনি আবার আদর্শহীন loose heterogeneous সমন্বয় গড়ে তুললে ভুল করা হবে। ঐক্য চাই, কিন্তু মূলগত চিন্তার ঐক্যের ভিত্তিতে, বৃহত্তম সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে, সংগ্রামের ভিত্তিতে। প্রকৃত কার্য্যকারী ঐক্য কেবলমাত্র সংগ্রামের মারফৎ নীচে থেকে গড়ে উঠতে পারে, তা না হলে ঐক্য হবে পড়ে ওপরের কাগজী ঐক্য। প্রকৃত সংগ্রামী ঐক্য গড়ার জন্য সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার ষ্টুডেণ্টস্‌ ব্যুরো তার জন্ম থেকে আপ্রাণ চেষ্টা করে আসছে, সাধারণ ছাত্রদের সেই চেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে নিজেদের স্বার্থে। যারা এই সংগ্রামী ঐক্যবদ্ধতা গড়ার চেষ্টা বানচাল করার চেষ্টা করবে তারা এমন কি না চাইলেও objectively ফ্যাসিষ্টদের দালালীই করবে—এই কথাটা বুঝে এগিয়ে আসতে হবে।

দেশবন্ধু কটন মিলস্‌ লিমিটেড

৬১, ক্রস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

জরুরী ঘোষণা

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, ১৯৪৫ সালের ঘোষিত লভ্যাংশ যাহা অংশীদারগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে কিন্তু তাঁহাদের ঠিকানা পরিবর্ত্তনের জন্য ফেরৎ আসিয়াছে, তাহা ১৯৪৯ সনের ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যে তাঁহাদের পরিবর্তিত সঠিক ঠিকানা হেড অফিসে জানাইয়া উক্ত লভ্যাংশ পুনরায় পাঠাইতে সহায়তা করিবেন, অন্যথায় উক্ত টাকা উক্ত তারিখের পরে লভ্যাংশ হিসাবভুক্ত হইয়া থাকিবে।

আরও কয়েকটী (সহজ কিস্তীতে পরিশোধনীয়) ১০৲ টাকা মূল্যের অর্ডিনারী বাজেয়াপ্ত অংশ (ordinary forfieted shares) বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট নিযুক্ত হইবে। নূতন অংশীদারগণও পুরাতন অংশীদারগণের মতই সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হইবেন।

শ্রী বি, এন, বোস,
জেনারেল সেক্রেটারী

গণদাবী

নভেম্বর বিপ্লবের ডাক

(১৯ পৃষ্ঠার পর)

বিপ্লবী নেতৃত্বের অধীনে সংগঠিত থাকে তাহা হইলেই কেবলমাত্র পুঁজিবাদী ফ্যাসিবাদীদের এই ষড়যন্ত্রকে বিধ্বস্ত করা সম্ভব। সুতরাং যুদ্ধ ঠেকাইবার সর্বপ্রধান হাতিয়ার হইল পুঁজিবাদ বিরোধী সংগ্রামী জনতার ঐক্য; তাহাদের সংগ্রামী সংগঠন। জনসাধারণ যুদ্ধ চায় না —ইহা সত্য কিন্তু তাই বলিয়া এই না চাওয়ার অর্থ চুপ করিয়া বসিয়া থাকা নয়। যুদ্ধ যখন আসিবে তখন তাহাকে প্রতিরোধ করিলেই চলিবে এই মনোভাব সর্বনাশ ডাকিয়া আনিবে। ইহা যুদ্ধ বিরোধী গণশক্তিকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলিয়া প্রতিবিপ্লবীর শক্তির কাছে পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য করিবে।

আবার যদি এই যুদ্ধ বিরোধী ফ্রন্টকে গণফ্রন্ট হিসাবে না ভাবিয়া দলীয়ফ্রন্ট ভাবা হয় তাহা হইলেও মারাত্মক ভুল করা হইবে; ফ্যাসিবাদী যুদ্ধচক্রান্তকে রোধ করা সম্ভব হইবে না। তাই প্রতিটি যুদ্ধ-বিরোধী শক্তিকে এই গণ-মোর্চায় আনিতে হইবে। বর্ত্তমান বিশ্ব শ্রেণী সম্বন্ধের অবস্থায় দক্ষিণপন্থী সোস্যাল ডিমোক্র্যাটদের এই মোর্চায় পাওয়ার আশা বাতুলতা। ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলির অধিকাংশতে তাহারা শাসন কার্য্য চালাইতেছে, ফ্যাসিবাদের শেষ ও কৌশলী শক্তি তাহারা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সমগ্র সোস্যাল ডিমোক্র্যাটিক শিবিরকে এই ফ্যাসিবাদী যুদ্ধ-শিবিরে ঠেলিয়া দিলে ভুল করা হইবে। ধনতন্ত্রের অগ্রগতির সাথে সমাজ যখন প্রধানতঃ দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যায় তখন প্রধান দুইটি শ্রেণীর চারিদিকে অন্যান্য অনেকগুলি মিত্র শক্তিও বর্ত্তমান থাকে। বুর্জোয়া চিন্তাধারার মধ্যে শুধু চার্চিল গোষ্ঠিও জন্মায় নাই, তাহার মিত্র এটলি বেভিনেরও জন্ম হইয়াছে— রক্ষণশীল পুঁজিবাদীর পার্শ্বে দক্ষিণপন্থী সোস্যাল ডিমোক্র্যাটরাও স্থান করিয়া লইয়াছে। ঠিক আবার তেমনই সর্ব্বহারা শ্রেণীর চারিদিকে এমন অনেকগুলি উপশ্রেণী থাকে যাহাদের মধ্যবিত্তসুলভ অস্থির চিত্ততা ও দোদুল্যমানতা থাকিলেও সর্ব্বহারা শ্রেণীর সহিত সংযোগ অপেক্ষাকৃত বেশী। এই বিরাট বিচিত্র শক্তি সর্ব্বহারা শ্রেণীভুক্ত নয় কিন্তু বেশীর ভাগই তাহার মিত্র। ইহাদের একাংশ লইয়া বামপন্থী সোস্যাল ডিমোক্র্যাসি গঠিত। সোস্যাল ডিমোক্র্যাসির অংশ হইলেও ইহাদের সাম্যবাদের প্রতি আকর্ষণ বেশী। এই বামপন্থী সোস্যাল ডেমোক্র্যাসি আবার প্রধানতঃ গোটা সোস্যাল ডিমোক্র্যাসির তলার অংশ। সুতরাং এই যুদ্ধবিরোধী শিবিরে সোস্যাল ডিমোক্র্যাট নেতৃত্ব—দক্ষিণপন্থী সোস্যাল ডিমোক্র্যাটদের না পাইলেও সোস্যাল ডিমোক্র্যাসির এক বিরাট অংশ, তাহার শ্রমজীবী নীচের অংশ পাওয়া সম্ভব। এক কথায় ইহাদিগকে দালাল বলিয়া প্রতিক্রিয়ার শিবিরে জোর করিয়া ঠেলিয় দেওয়া নির্বুদ্ধিতা। শুধু নির্বুদ্ধিতা নয় অতি বামপন্থা বৈপ্লবিক বিচ্যুতি। দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির মত ইহাও বিপ্লবী প্রস্তুতির পক্ষে ক্ষতিকারক। সোভিয়েট ইউনিয়নের বলশেভিক পার্টির বিপ্লব সফল করার পিছনে এই মিত্র শক্তি চিনিবার শক্তি ভালভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে। আজ নভেম্বর বিপ্লব দিবস পালনের দিনে আমাদের সেই শিক্ষাই লইতে হইবে। দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদ নয়, অতিবিপ্লবী বিচ্যুতিও নয়; সঠিক নেতৃত্ব, সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে বিভিন্ন পুঁজিবাদ বিরোধী শক্তির ঐক্য, সংগ্রামী সংঘবদ্ধতা ইহা অর্জন করাই ঐতিহাসিক প্রয়োজন। ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতির মারফৎ ফ্যাসিবাদী যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করুন। নভেম্বর বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক।

শোষিত মেহনতকারী জনতার

একমাত্র সাপ্তাহিক

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের হিন্দী মুখপত্র

হামারা পথ

পড়ুন

কার্য্যালয় :—৪৮, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

শ্রমিকের উপর মালিকের জুলুম

রয়েল ক্যালকাটা গল্‌ফ ক্লাবের শ্রমিকদের অযথা হায়রানী

রয়েল ক্যালকাটা গল্‌ফ ক্লাব ওয়ার্কার্স-ইউনিয়নের সম্পাদক, কমরেড অজিত সেন নিম্নোক্ত মর্মে এক বিবৃতি দিয়াছেন :—

"কিছুদিন পূর্ব্বে রয়েল ক্যালকাটা গল্‌ফ ক্লাবের কেরোসিন তেল চুরি যাইতে থাকিলে ক্লাব কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়া তাহাদিগকে জঘন্য ভাষায় গালাগালি এবং অযথা হায়রানী করিতে থাকে। ইহাতে শ্রমিকদের মধ্যে যথেষ্ট বিক্ষোভ দেখা দেয়; অবশেষে সুকর মাহাতো নামক জনৈক শ্রমিকের প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয় যে, এ ক্লাবের 'ছোট সাহেবের' কয়েকজন আপনার লোক এই তেল চুরির ব্যাপারে লিপ্ত। ছোট সাহেবের সম্মুখে হাতেনাতে চুরি ধরাইয়া দিলেও দুষ্কৃতদের কোনরূপ শাস্তি হল না; বরং যাহারা চোর ধরার বিষয়ে চেষ্টা করে তাহাদিগকেই হায়রানী ও শাস্তি ভোগ করিতে হয়।

"এই ঘটনার অব্যবহিত পরে কেষ্ট নামক জনৈক শ্রমিকের বিরুদ্ধে উক্ত ছোট সাহেব আদেশ পালন না করার অভিযোগ আনেন অথচ বাস্তবে ছোট সাহেব তাহাকে কোন আদেশই করেন নাই।

"বাইজু নামক জনৈক শ্রমিক কিছুদিন আগে যখন সামান্য কিছু জ্বালানী কাঠ নিজের প্রয়োজনের জন্য সংগ্রহ করিতেছিল তখন ছোট সাহেব থানায় ফোন করিয়া পুলিশ ডাকিয়া আনিয়া বাইজুকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দেন এবং বলেন যে সে ক্লাবে কাজ করে না ও ক্লাবের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু বাইজু যখন ক্লাবের টোকেনের সাহায্যে প্রমাণ করে যে, সে ক্লাবের একজন শ্রমিক এবং স্বাক্ষ্য প্রমাণ দেয় যে ক্লাবের শ্রমিকরা সকলেই সাহেবদের অনুমতিতেই জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়।"

'ইহা ছাড়াও প্রায় প্রত্যহ কোন না কোন অজুহাতে ছোট সাহেব শ্রমিকদিগকে বিশেষ করিয়া শ্রমিকইউনিয়নের জঙ্গী কর্মীদিগকে অযথা হায়রানী করাইতেছেন।"

"এই সব অত্যাচারের প্রতিকারের দাবী করিয়া ইউনিয়ন লেবার কমিশনারের নিকট সমস্ত বিষয় এবং ১৫দিনের মধ্যে ছোট সাহেবকে বরখাস্ত না করিলে শ্রমিকরা কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামিতে বাধ্য হইবে এই কথা জানাইয়া চিঠি দিয়াছে।

"অত্যাচারিত শ্রমিকদের তরফ হইতে আমি জনসমর্থন প্রার্থনা করি।"

ক্যালকাটা পিজরাপোল সোসাইটির মালিক শ্রমিক বিরোধ

শ্রমিকদের হরতালের সময় আই, এন, টি, ইউ, সি-র সহ-সভাপতি বেরী সাহেবের মালিক পক্ষ অবলম্বন

গত ৭ মাস যাবৎ পিজরাপোল সোসাইটির শ্রমিকরা তাহাদের মজুরী বাড়াইবার জন্য অধিকারীবর্গের কাছে আবেদন জানাইয়া ও কংগ্রেসী সরকারের লেবারকমিশনারের মধ্যস্থতায় আপোষ আলোচনার মারফৎ মাহিনা বাড়াইবার চেষ্টা করিয়া বিফল হয়। অতঃপর তাহারা তাহাদের মজুরী বাড়াইবার জন্য ২৪শে অক্টোবর '৪৯ হইতে হরতাল সুরু করে। হরতাল সুরু হইলে অধিকারীবর্গ প্রথমে পুলিশের ভয় দেখাইয়া ও দালাল দিয়া হরতাল ভাঙ্গিবার চেষ্টা করে কিন্তু সংগ্রামী শ্রমিকের মনোভাব অটুট থাকে। শ্রমিকদের হরতাল বিনা সর্ত্তে বন্ধ করিবার জন্য মালিকের পক্ষ হইতে আই. এন. টি. ইউ. সির নেতা বেরী সাহেব শ্রমিকদের অনুরোধ করেন। ইহাতেও শ্রমিকরা রাজী না হওয়ায় বেরী সাহেব চটিয়া গিয়া শ্রমিকদের দাবী লইয়া অগ্রসর হইতে অসম্মতি জানান। হরতালের সময় শ্রমিকরা মালিককে তাহাদের দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য করিবার জন্য লেবার কমিশনারকে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি দু-মনা ভাবে বলেন—"আচ্ছা আমি চেষ্টা করব"। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকরা কিছুই ফল দেখিতে পান না। অন্যদিকে মালিকপক্ষ লেবার কমিশনারকে "কেস"টি ট্রাইব্যুনালে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি অনুগতের মত সেই প্রস্তাব লইয়া শ্রমিকদের সামনে উপস্থিত হন। শ্রমিকরা এই প্রস্তাব মানিয়া লইলেও তাহাদের কাছে ইহা পরিষ্কার হইয়া যায় যে লেবার কমিশনার ও আই. এন. টি. ইউ. সির নেতারা মুখে শ্রমিকদরদী হইলেও বাস্তবে তাঁহারা মালিকপক্ষের স্বার্থ রক্ষার জন্যই সর্ব্বদা সজাগ থাকেন।

সম্পাদক প্রীতিশ চন্দ কর্তৃক পরিবেষক প্রেস ২৩ ডিক্‌সন লেন হইতে মুদ্রিত ও ৪৮ ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত।